বার ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হুসাইন তাবাতাবাঈ
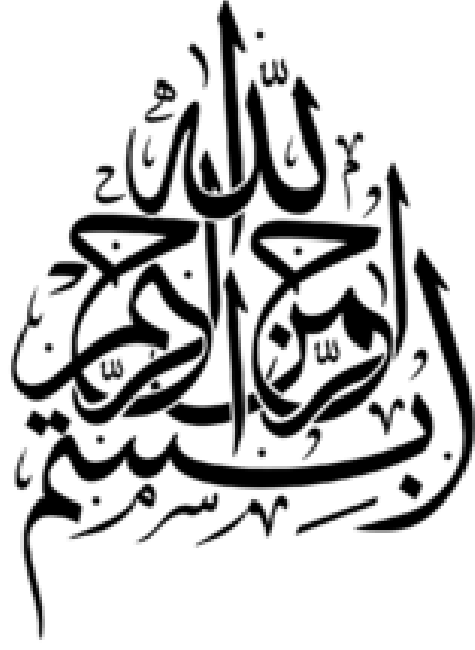
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রথম ইমাম

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)- ই সর্বপ্রথম ইমাম । তিনি মহানবী (সা.) এর চাচা এবং বনি হাশিম গোত্রের নেতা জনাব আবু তালিবের সন্তান ছিলেন । আল্লাহর রাসূল (সা.)- এর এই চাচাই শৈশবেও তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তিনি নিজের ঘরে মহানবী (সা.)- কে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং লালন পালনের মাধ্যমে তাকে বড় করেছিলেন । মহানবী (সা.)এর নবুয়ত প্রাপ্তির ঘোষণার পর থেকে নিয়ে যত দিন তিনি (আবু তালিব) জীবিত ছিলেন, মহানবী (সা.)- কে সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থন করেছিলেন । তিনি সবসময়ই মহানবী (সা.)- কে কাফেরদের, বিশেষ করে কুরাইশদের সার্বিক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন । হযরত ইমাম আলী (আ.) (প্রশিদ্ধ মতানুযায়ী) মহানবী (সা.)- এর নবুয়ত প্রাপ্তির ঘোষণার প্রায় দশ বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন । হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর জন্মের প্রায় ছ'বছর পর মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল । মহানবী (সা.)- এর আবেদনক্রমে ঐসময় হযরত আলী (আ.) বাবার বাড়ী থেকে মহানবী (সা.)- এর বাড়িতে স্থানান্তরিত হন । তারপর থেকে হযরত ইমাম আলী (আ.) সরাসরি মহানবী (সা.)- এর অভিভাবকত্ব ও তত্বাবধানে তাঁর কাছে লালিত পালিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন ।[১] মহানবী (সা.) হেরা গুহায় অবস্থানকালে তার কাছে সর্বপ্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ওহী' বা ঐশীবাণী অবতির্ণ হয় । যার ফলে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন । এরপর হেরা গুহা থেকে বের হয়ে মহানবী (সা.) নিজ গৃহে যাওয়ার পথে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর সাথে তার সাক্ষাত ঘটে এবং তিনি তার কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন । হযরত ইমাম আলী (আ.) সাথে সাথেই মহানবী (সা.)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন ।[২] অতঃপর নিকট আত্মীয়দেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানোর উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) তাদের সবাইকে নিজ বাড়িতে খাওয়ার আমন্ত্রন জানিয়ে সমবেত করেন । ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সবার প্রতি লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে,

‘আপনাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম আমার আহবানে (ইসলাম গ্রহণে) সাড়া দেবে, সেই হবে আমার খলিফা, উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধি । কিন্তু উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে একমাত্র যে ব্যক্তিটি সর্বপ্রথম উঠে দাড়িয়ে সেদিন বিশ্বনবী (সা.)- এর আহবানে সাড়া দিয়েছিল এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তিনিই হচ্ছেন হযরত ইমাম আলী (আ.) । আর বিশ্বনবী (সা.) সেদিন (তার প্রতি) হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর ঈমানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং স্বঘোষিত প্রতিশ্রুতিও তিনি তার ব্যাপারে পালন করেছিলেন ।[৩] এভাবে হযরত ইমাম আলী (আ.)- ই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলিম । আর তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি কখনই মূর্তি পুজা করেননি । মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গমনের পূর্ব পর্যন্ত হযরত ইমাম আলী (আ.)- ই ছিলেন মহানবী (সা.)- এর নিত্যসঙ্গী । মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা গমনের রাতে হযরত ইমাম আলী (আ.)- ই মহানবী (সা.) এর বিছানায় শুয়ে ছিলেন । ঐ রাতেই কাফেররা মহানবী (সা.) এর বাড়ী ঘেরাও করে শেষরাতের অন্ধকারে মহানবী (সা.)- কে বিছানায় শায়িত অবস্থায় হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল । মহানবী (সা.) কাফেরদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হবার পূর্বে ই গৃহত্যাগ করে মদীনার পথে পাড়ি দিয়েছিলেন ।[৪] এরপর হযরত ইমাম আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর নির্দেশ অনুযায়ী তার কাছে গচ্ছিত জনগণের আমানতের মালা- মাল তাদের মালিকদের কাছে পৌছে দেন । তারপর তিনিও নিজের মা, নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.) ও অন্য দু’জন স্ত্রীলাক সহ মদীনার পথে পাড়ি দেন ।[৫] এমনকি মদীনাতেও হযরত ইমাম আলী (আ.)- ই ছিলেন মহানবী (সা.)- এর নিত্যসঙ্গী । নির্জনে অথবা জনসমক্ষে তথা কোন অবস্থাতেই মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- কে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখেননি । তিনি স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা (আ.)- কেও হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর কাছেই বিয়ে দেন । সাহাবীদের উপস্থিতিতে মহানবী (সা.), হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের ঘোষণা দেন ।[৬] একমাত্র ‘তাবুকের’ যুদ্ধ ছাড়া বিশ্বনবী (সা.) (স্বীয় জীবদ্দশায়) যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, হযরত ইমাম আলী (আ.)- ও সেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় বিশ্বনবী (সা.) হযরত ইমাম আলী (আ.)- কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন ।[৭] এ ছাড়াও

হযরত ইমাম আলী (আ.) কোন যুদ্ধেই আদৌ পিছপা হননি । জীবনে কোন শত্রুর মোকাবিলায় তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি । তিনি জীবনে কখনোই মহানবী (সা.)- এর আদেশের অবাধ্যতা করেননি । তাই তার সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.) বলেছেন যে, আলী কখনই সত্য থেকে অথবা সত্য আলী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না ।[৮] বিশ্বনবী (সা.)- এর মৃত্যুর সময় হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বয়স ছিল প্রায় তেত্রিশ বছর । বিশ্বনবী (সা.)- এর সকল সাহাবীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইসলামের সকল মহত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনিই । সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইমাম আলী (আ.) বয়সের দিক থেকে ছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ । আর ইতিপূর্বে বিশ্বনবী (আ.)- এর পাশাপাশি অংশগ্রহণকৃত যুদ্ধসমুহে যে রক্তপাত ঘটেছিল, সে কারণে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর প্রতি অনেকেই শত্রুতা পোষণ করত । এসব কারণেই বিশ্বনবী (সা.)- এর পরলোক গমনের পর হযরত আলী (আ.)- কে খেলাফতের পদাধিকার লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল । আর এর মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রিয় কাজ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । তাই বাধ্য হয়ে তখন তিনি নিরালায় জীবন যাপন করতে শুরু করেন এবং ব্যক্তি প্রশিক্ষণের কাজে নিজেকে ব্যপৃত করেন । মহানবী (সা.)- এর মৃত্যুর প্রায় ২৫ বছর পর তিনজন খলিফার শাসনামল শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই জীবন যাপন করতে থাকেন । তারপর তৃতীয় খলিফা নিহত হবার পর জনগণ হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর কাছে ‘বাইয়াত’ (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন এবং তাকে খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত করেন ।

হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর খেলাফতকাল ছিল প্রায় ৪ বছর ৯ মাস । তিনি তার এই খেলাফতের শাসন আমলে সম্পূর্ণরূপে মহানবী (সা.)- এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করেন । তিনি তার খেলাফতকে আন্দোলনমুখী এক বিপ্লবীরূপ প্রদান করে ছিলেন । তিনি তার শাসন আমলে ব্যাপক সংস্কার সাধান করেন । অবশ্য ইমাম আলী (আ.)- এর ঐসব সংস্কারমূলক কর্মসূচী বেশকিছু সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে ছিল । এ কারণে উম্মুল মু’মিনীন আয়শা, তালহা, যুবাইর ও মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে বেশকিছু সংখ্যক সাহাবী হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেন । তৃতীয় খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীর

শ্লোগানকে তারা হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর বিরুদ্ধে একটি মোক্ষম রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করে । আর তারা ইসলামী রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত করার মাধ্যমে এক ব্যাপক রাজনৈতিক অরাজকতার সৃষ্টি করে । যার ফলে উদ্ভুত ফিৎনা ও অরাজকতা দমনের জন্যে বসরার সন্নিকটে ইমাম আলী (আ.) নবীপ্রত্নি আয়শা, তালহা, ও যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতির্ণ হতে বাধ্য হন । ইসলামী ইতিহাসের ঐ যুদ্ধটিই 'জঙ্গে জামাল' নামে পরিচিত । এ ছাড়াও ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তে অনুরূপ কারণে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হযরত ইমাম আলী (আ.) 'সিফফিন' নামক আরও একটি যুদ্ধে অবতির্ণ হতে বাধ্য হন । 'সিফফিন' নামক ঐ যুদ্ধ দীর্ঘ দেড় বছর যাবৎ অব্যাহত ছিল । ঐ যুদ্ধ শেষ না হতেই 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে 'খাওয়ারেজ' (ইসলাম থেকে বহিস্কৃত) নামক বিদ্রোহিদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধ লিপ্ত হতে হয় । ঐ যুদ্ধিটি ইতিহাসে 'নাহরাওয়ানের' যুদ্ধ নামে পরিচিত । এভাবে হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর সমগ্র খেলাফতকালই আভ্যন্তরীণ মতভেদ জনিত সমস্যা সমাধানের মধ্যেই অতিক্রান্ত হয় । এর কিছুদিন পরই ৪০ হিজরীর রমযান মাসের ১৯ তারিখে কুফার মসজিদে ফজরের নামাযের ইমামতি করার সময় জনৈক 'খারেজির' তলোয়ারের আঘাতে তিনি আহত হন । অতঃপর ২০শে রমযান দিবাগত রাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[৯] ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং শত্রু ও মিত্র, উভয়পক্ষের স্বীকারোক্তি অনুসারে মানবীয় গুণাবলীর দিক থেকে আমিরুল মু'মিনীন হযরত ইমাম আলী (আ.) ছিলেন সর্বশেষ্ঠ এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম ক্রুটির অস্তিত্বও তার চরিত্রে ছিল না । আর ইসলামে মহত গুণাবলীর দিক থেকে তিনি ছিলেন বিশ্বনবী (সা.)- এর আদর্শের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিভু ।

ইমাম আলী (আ.)- এর মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এ যাবৎ যত আলোচনা হয়েছে এবং শীয়া, সুন্নী, জ্ঞানী গুণী ও গবেষকগণ যে পরিমাণ গ্রন্থাবলী তার সম্পর্কে আজ পর্যন্ত রচনা করেছেন, ইতিহাসে এমনটি আর অন্য কারও ক্ষেত্রেই ঘটেনি । হযরত ইমাম আলী (আ.) ছিলেন সকল মুসলমান এবং বিশ্বনবী (সা.)- এর সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানীব্যক্তি । ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি তার অগাধ জ্ঞানগর্ভ বর্ণনার মাধ্যমে ইসলামে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেন । এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারে দর্শন চর্চার মাত্রা যোগ্য করেন । তিনিই কুরআনের জটিল ও রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাখা করেন । কুরআনের বাহ্যিক শব্দাবলীকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার জন্যে তিনি আরবী ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র রচনা করেন । (এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়েও এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে) বীরত্বের ক্ষেত্রেও হযরত আলী (আ.) ছিলেন মানবজাতির জন্য প্রতীক স্বরূপ । বিশ্বনবী (সা.)- এর জীবদ্দশায় এবং তার পরেও জীবনে যত যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, কখনোই তাকে ভীত- সন্ত্রস্ত হতে বা মানসিক অস্থিরতায় ভূগতে দেখা যায়নি । এমনকি ওহুদ, হুনাইন, খান্দাক এবং খাইবারের মত কঠিন যুদ্ধগুলো যখন মহানবী (সা.)- এর সাহাবীদের অন্তরাত্মা কাপিয়ে দিয়েছিল এবং সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছত্রভঙ্গ হয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কঠিন মূহুর্তগুলোতেও হযরত ইমাম আলী (আ.) কখনোই শত্রুদের সম্মুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি । ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও খুজে পাওয়া যাবে না, যেখানে কোন খ্যাতিমান বীর যোদ্ধা ইমাম আলী (আ.)- এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিরাপদে নিজের প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে । তিনি এমন মহাবীর হওয়া সত্ত্বেও কখনও কোন দূর্বল লোককে হত্যা করেননি এবং তার নিকট থেকে পালিয়ে যাওয়া (প্রাণ ভয়ে) ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করেননি । তিনি কখনোই রাতের আধারে শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমন চালাননি । শত্রুপক্ষের জন্য পানি সরবরাহ কখনোই তিনি বন্ধ করেননি । এটা ইতিহাসের একটি সর্বজন স্বীকৃত ঘটনা যে, ইমাম আলী (আ.) খাইবারের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের দূর্গম দূর্গের বিশাল লৌহ তোরণটি তাঁর হাতের সামান্য ধাক্কার মাধ্যমে সম্পূর্ণ রূপে উপড়ে ফেলেছিলেন ।[১০]

একইভাবে মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে ইমাম আলী (আ.) কা'বা ঘরের মূর্তি গুলো ধ্বংস করেন । 'আকিক' পাথরের তৈরী 'হাবল' নামক মক্কার সর্ববৃহৎ মূর্তিটি কা'বা ঘরের ছাদে স্থাপিত ছিল । ইমাম আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর কাধে পা রেখে কা'বা ঘরের ছাদে উঠে একাই বৃহাদাকার মূর্তিটির মূলোৎপাটন করে নীচে নিক্ষেপ করেন ।[১১]

খোদাভীতি ও আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমাম আলী (আ.) ছিলেন অনন্য । জনৈক ব্যক্তির প্রতি ইমাম আলী (আ.)- এর রূঢ় ব্যবহারের অভিযোগের উত্তরে মহানবী (সা.) তাকে বলেছিলেন যে, আলীকে তিরস্কার করো না । কেননা সে তো আল্লাহর প্রেমিক ।[১২] একবার রাসূল (সা.)- এর সাহাবী হযরত আবু দারদা (রা.) কোন এক খেজর বাগানে ইমাম আলী (আ.)- এর দেহকে শুষ্ক ও নিঃস্প্রাণ কাঠের মত পড়ে থাকতে দেখেন । তাই সাথে সাথে নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (আ.)- এর কাছে তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পৌছালেন এবং নিজের পক্ষ থেকে শোকও জ্ঞাপন করেন । কিন্তু ঐ সংবাদ শুনে হযরত ফাতিমা (আ.) বললেন : না, আমার স্বামী মৃত্যু বরণ করেননি । বরং ইবাদত করার সময় আল্লাহর ভয়ে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন । আর এ অবস্থা তার ক্ষেত্রে বহু বারই ঘটেছে । অধীনস্থদের প্রতি দয়াশীলতা, অসহায় ও নিঃস্বদের প্রতি ব্যথিত হওয়া এবং দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি পরম উদারতার ব্যাপার ইমাম আলী (আ.)- এর জীবনে অসংখ্য ঘটনার অস্তিত্ব বিদ্যমান । ইমাম আলী (আ.) যা- ই উপার্জন করতেন, তাই অসহায় ও দরিদ্রদেরকে সাহায্যের মাধ্যমে আল্লাহর পথে দান করতেন । আর তিনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সহজ সরল ও কষ্টপূর্ণ জীবন যাপন করতেন । ইমাম আলী (আ.) কৃষি কাজকে পছন্দ করতেন । তিনি সাধারণতঃ পানির নালা কেটে সেচের ব্যবস্থা করতেন । বৃক্ষ রোপণ করতেন । চাষের মাধ্যমে মৃত জমি আবাদ করতেন । কিন্তু পানি সেচের নালা ও আবাদকৃত সব জমিই তিনি দরিদ্রদের জন্যে ‘ওয়াকফ’ (দান) করতেন । হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর পক্ষ থেকে দরিদ্রদের জন্যে ‘ওয়াকফ’কৃত ঐসব সম্পত্তির বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ ২৪ হাজার সোনার দিনারের সমতুল্য ছিল । তার ঐসব ‘ওয়াকফ্’কৃত সম্পত্তি ‘আলী (আ.)- এর সাদকা’ নামে খ্যাত ছিল ।[১৩]

দ্বিতীয় ইমাম

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)

হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) ছিলেন দ্বিতীয় ইমাম । তিনি আমিরুল মু'মিনীন হযরত ইমাম আলী (আ.) এবং নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (আ.)- এর প্রথম সন্তান এবং তৃতীয় ইমাম হযরত হুসাইন (আ.) এর ভাই ছিলেন । মহানবী (সা.) অসংখ্যবার বলেছেন : হাসান ও হুসাইন আমারই সন্তান । এমনকি হযরত ইমাম আলী (আ.) তার সকল সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য করে একই কথার পুনারুক্তি করেছিলেন । তিনি বলেছেনঃ তোমরা আমার সন্তান এবং হাসান ও হুসাইন আল্লাহর নবীর সন্তান ।[১৪] হযরত ইমাম হাসান (আ.) হিজরী ৩য় সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন ।[১৫] তিনি প্রায় সাত বছরেরও কিছু বেশী সময় মহানবী (সা.)- এর সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হন । তিনি বিশ্বনবী (সা.)- এর মৃত্যুর প্রায় তিন বা ছয় মাস পর যখন নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (আ.) পরলোক গমন করেন, তখন তিনি তার মহান পিতা হযরত আলী (আ.)- এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে থাকেন । পিতার শাহাদতের পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পিতার 'ওসিয়াত' অনুযায়ী তিনি ইমামতের পদে আসীন হন । অতঃপর তিনি প্রকাশ্যে খেলাফতের পদাধিকারীও হন । প্রায় ৬মাস যাবৎ তিনি খলিফা হিসেবে মুসলমানদের রাষ্ট্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন । কিন্তু মুয়াবিয়া ছিলেন নবীবংশের চরম ও চিরশত্রু । ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় খেলাফতের মসনদ অধিকারের লাভে ইতিপূর্বে বহু যুদ্ধের সূত্রপাত সে ঘটিয়ে ছিল (প্রথমত : ৩য় খলিফার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের ছলনাময়ী রাজনৈতিক শ্লোগানের ধোয়া তুলে এবং পরবর্তীতে সরাসরি খলিফা হওয়ার দাবী করে) । তখন ইরাক ছিল হযরত ইমাম হাসান (আ.)- এর খেলাফতের রাজধানী । মুয়াবিয়া হযরত ইমাম হাসান (আ.)- কে কেন্দ্রীয় খেলাফতের পদ থেকে অপসারণের লক্ষ্যে ইরাক সীমান্তে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে । একইসাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে গোপনে ইমাম হাসান (আ.)- এর সেনাবাহিনীর বহু অফিসারকে ক্রয় করে । এমনকি ঘুষ ছাড়াও অসংখ্য প্রতারণামূলক লোভনীয় প্রতিশ্রুতি প্রদানের

মাধ্যমে মুয়াবিয়া, ইমাম হাসান (আ.)- এর সেনাবাহিনীকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাতে সক্ষম হয় ।[১৬]

যার পরিণামে হযরত ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন । উক্ত চুক্তি অনুসারে হযরত ইমাম হাসান (আ.) প্রকাশ্যে খেলাফতের পদত্যাগ করতে বাধ্য হন । চুক্তির শর্ত অনুসারে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পরপরই হযরত ইমাম হাসান (আ.) পুনরায় খলিফা হবেন এবং খেলাফতের পদ নবীবংশের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে । আর এই অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে মুয়াবিয়া শীয়াদের যে কোন প্রকারের রাষ্ট্রিয় নিপীড়ন থেকে বিরত থাকবে ।[১৭] আর এভাবেই মুয়াবিয়া কেন্দ্রীয় খেলাফতের পদ দখল করতে সমর্থ হয় এবং ইরাকে প্রবেশ করে । কিন্তু ইরাকে প্রবেশ করে সে এক জনসভার আযোজন করে । ঐ জনসভায় প্রকাশ্যভাবে জনসমক্ষে সে ইমাম হাসান (আ.)- এর সাথে ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করে।[১৮] আর তখন থেকেই সে পবিত্র আহলে বাইত (নবীবংশ) ও তাদের অনুসারী শীয়াদের উপর সর্বাত্মক অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতে শুরু করে । হযরত ইমাম হাসান (আ.) তার দীর্ঘ দশ বছর সময়কালীন ইমামতের যুগে শাসকগোষ্ঠির পক্ষ থেকে সৃষ্ট প্রচন্ড চাপের মুখে এক শ্বাসরূদ্ধকর পরিবেশে জীবন যাপন করতে বাধ্য হন । এমনকি নিজের ঘরের মধ্যকার নিরাপত্তাও তিনি হারাতে বাধ্য হন । অবশেষে হিজরী ৫০সনে মুয়াবিয়ার ষড়যন্তে ইমাম হাসান (আ.) জনৈকা স্ত্রীর দ্বারা বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[১৯] মানবীয় গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে হযরত ইমাম হাসান (আ.) ছিলেন স্বীয় পিতা ইমাম আলী (আ.) এর স্মৃতিচিহ্ন এবং স্বীয় মাতামহ মহানবী (সা.)- এর প্রতিভু । মহানবী (সা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, হযরত ইমাম হাসান (আ.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) সবসময়ই তাঁর সাথে থাকতেন । এমনকি মহানবী (সা.) প্রায়ই তাদেরকে নিজের কাধেও চড়াতেন ।

শীয়া ও সুন্নী উভয় সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন : আমার এই দু'সন্তানই (ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন) ইমাম, তারা আন্দোলন করুকু অথবা না করুক, সব অবস্থাতেই তারা ইমাম (এখানে আন্দোলন বলতে প্রকাশ্যে খেলাফতের অধিকারী হওয়া বা না

হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে)[২০] । এ ছাড়া হযরত ইমাম হাসান (আ.)- এর ইমামতের পদাধিকার লাভ সম্পর্কে মহানবী (সা.) এবং হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর পক্ষ থেকে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান রয়েছে ।

তৃতীয় ইমাম

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)

'শহীদকূলশিরোমণি' হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) ছিলেন হযরত ইমাম আলী (আ.) ও হযরত ফাতিমা (আ.)- এর দ্বিতীয় সন্তান । তিনি চতুর্থ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন । বড় ভাই হযরত ইমাম হাসানের শাহাদতের পর তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং ইমাম হাসান (আ.)- এর 'ওসিয়ত' ক্রমে ৩য় ইমাম হিসেবে মনোনীত হন ।[২১] হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) - এর ইমামতকাল ছিল দশ বছর । তার ইমামতের শেষ ৬মাস ছাড়া বাকী সমগ্র ইমামতকালই মুয়াবিয়ার খেলাফতের যুগেই কেটেছিল । তার ইমামতের পুরা সময়টাতেই তিনি অত্যন্ত কঠিন দূরযোগপূর্ণ ও শ্বাসরূদ্ধকর পরিবেশে জীবন যাপন করেন । কারণ, ঐযুগে ইসলামী আইন-কানুন মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছিল । তখন খলিফার ব্যক্তিগত ইচ্ছাই আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর ইচ্ছার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়ে । মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীসাথীরা পবিত্র আহলে বাইতগণ (আ.) ও শীয়াদের ধ্বংস করা এবং ইমাম আলী (আ.) ও তার বংশের নাম নিশ্চিহ্ন করার জন্যে এমন কোন প্রকার কর্মসূচী নেই যা অবলম্বন করেনি । শুধু তাই নয় মুয়াবিয়া স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করার মাধ্যমে স্বীয় ক্ষমতার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে । কিন্তু ইয়াযিদের চরিত্রহীনতার কারণে একদল লোক তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল । তাই মুয়াবিয়া এ ধরণের বিরোধীতা রোধের জন্যে অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে । ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আর অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক, হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- কে এক অন্ধকারাচ্ছান্ন দূর্দিন কাটাতে হয়েছে । মুয়াবিয়া ও তার অনুচরদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার

মানসিক অত্যাচার তাকে নিরবে সহ্য করতে হয়েছিল । অবশেষে হিজরী ৬০ সনের মাঝামাঝি সময়ে মুয়াবিয়া মৃত্যু বরণ করে । তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইয়াযিদ তার স্থলাভিষিক্ত হয় ।[২২] সে যুগে 'বাইয়াত' (আনুগত্য প্রকাশের শপথ গ্রহণ) ব্যবস্থা আরবদের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল । বিশেষ করে রাষ্ট্রিয়কার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্তির মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে 'বাইয়াত' গ্রহণ করা হত । বিশেষ করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের পক্ষ থেকে রাজা বাদশা বা খলিফার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশের জন্যে অবশ্যই 'বাইয়াত' গ্রহণ করা হত । 'বাইয়াত' প্রদানের পর তার বিরোধীতা করা বিরোধী ব্যক্তির জাতির জন্যে অত্যন্ত লজ্জাকর ও কলঙ্কের বিষয় হিসেবে গণ্য করা হত । এমনকি মহানবী (সা.)- এর জীবনাদর্শে ও স্বাধীন ও ঐচ্ছিকভাবে প্রদত্ত 'বাইয়াতে'র নির্ভরযোগ্যতার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল । মুয়াবিয়াও তার জাতীয় প্রথা অনুযায়ী তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে জনগণের কাছ থেকে স্বীয়পুত্র ইয়াযিদের জন্যে 'বাইয়াত' সংগ্রহ করে । কিন্তু মুয়াবিয়া এ ব্যাপারে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বাইয়াত গ্রহণের ব্যাপারে তাকে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করেনি । শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পূর্বে সে ইয়াযিদকে বিশেষভাবে ওসিয়াত করে গিয়েছিল[২৩] যে, ইমাম হুসাইন (আ.) যদি তার (ইয়াযিদ) আনুগত্য স্বীকার (বাইয়াত) না করে, তাহলে সে (ইয়াযিদ) যেন এ নিয়ে আর বেশী বাড়াবাড়ি না করে । বরং নীরব থেকে এ ব্যাপারটা যেন সে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে । কারণঃ মুয়াবিয়া এ ব্যাপারে আদ্যোপান্ত চিন্তা করে এর দুঃসহ পরিণাম সম্পর্কে উপলদ্ধি করতে পরেছিল।

কিন্তু ইয়াযিদ তার চরম অহংকার ও দুঃসাহসের ফলে পিতার 'ওসিয়তের' কথা ভুলে বসল । তাই পিতার মৃত্যুর পর পরই সে মদীনার গভর্ণরকে তার (ইয়াযিদ) পক্ষ থেকে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর কাছ থেকে 'বাইয়াত' গ্রহণের নির্দেশ দিল । শুধু তাই নয়, ইমাম হুসাইন (আ.) যদি 'বাইয়াত' প্রদান অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার কর্তিত মস্তক দামেস্কে পাঠানোর জন্যেও মদীনার গভর্ণরের কাছে কড়া নির্দেশ পাঠানো হয় ।[২৪]

মদীনার প্রশাসক হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- কে যথা সময়ে ইয়াযিদের নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করেন । ইমাম হুসাইন (আ.) ঐ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখার জন্যে কিছু অবসর চেয়ে নিলেন। আর ঐ রাতেই তিনি স্বপরিবারে মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা নগরী ত্যাগ করেন ।

মহান আল্লাহ ঘোষিত মক্কার 'হারাম শরীফের' নিরাপত্তার বিধান অনুযায়ী তিনি সেখানে আশ্রয় নেন । সময়টা ছিল হিজরী ৬০ সনে রজব মাসের শেষ ও শা'বান মাসের প্রথম দিকে । ইমাম হুসাইন (আ.) প্রায় চার মাস যাবৎ মক্কায় আশ্রিত অবস্থায় কাটান । আর ধীরে ধীরে এ সংবাদ তদানিন্তন ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । মুয়াবিয়ার অত্যাচারমূলক ও অবৈধ শাসনে ক্ষিপ্ত অসংখ্য মুসলমান ইয়াযিদের এহেন কার্যকলাপে আরও অসন্তুষ্ট ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল । তারা সবাই ইমাম হুসাইন (আ.)- এর প্রতি নিজেদের সহমর্মিতা প্রকাশ করল । পাশাপাশি ইরাকের বিভিন্ন শহর থেকে, বিশেষ করে ইরাকের কুফা শহর থেকে সেখানে গমনের আমন্ত্রনমূলক চিঠির বন্যা মক্কায় ইমাম হুসাইন (আ.)- এর কাছে প্রবাহিত হতে লাগলো । ঐসব চিঠির বক্তব্য ছিল একটাই আর তা হল, ইমাম হুসাইন (আ.) যেন অনুগ্রহ পূর্বক ইরাকে গিয়ে সেখানকার জনগণের নেতৃত্বের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে যেন তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন । এ বিষয়টি ইয়াযিদের জন্যে অবশ্যই অত্যন্ত বিপদজনক ব্যাপার ছিল । মক্কায় ইমাম হুসাইন (আ.)- এর অবস্থান হজ্জ মৌসুম শুরু হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে । সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানরা দলে দলে হজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় সমবেত হতে লাগল। হাজীরা সবাই হজ্জপর্ব সম্পূর্ণের জন্যে পস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে । ইতিমধ্যে গোপন সূত্রে ইমাম হুসাইন (আ.) অবগত হলেন যে, ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু অনুচর হাজীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেছে । ইহরামের কাপড়ের ভতর তারা অস্ত্র বহন করছে । তারা হজ্জ চলাকালীন সময়ে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- কে তাদের ইহরামের কাপড়ের ভেতর লুকানো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করবে ।[২৫]

ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযিদের গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপার টের পেয়ে স্বীয় কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করে মক্কা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন । এ সিদ্ধান্তের পর হজ্জ উপলক্ষ্যে আগত বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে

তিনি সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্য পেশ করেন ।[২৬] ঐ বক্তব্যে তিনি ইরাকের পথে যাত্রা করার ব্যাপারে নিজ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন । একই সাথে তার আসন্ন শাহাদত প্রাপ্তির কথাও তিনি ঐ জনসভায় ব্যক্ত করেন । আর তাকে ঐ মহান লক্ষ্যে (অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) সহযোগিতা করার জন্যে উপস্থিত মুসলমানদেরকে আহবান্ জানান । উক্ত বক্তব্যের পরপরই তিনি কিছু সংখ্যক সহযোগীসহ স্বপরিবারে ইরাকের পথে যাত্রা করেন ।

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) কোন ক্রমেই ইয়াযিদের কাছে 'বাইয়াত' প্রদান না করার জন্যে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন । তিনি ভাল করেই জানতেন যে, এ জন্যে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে । তিনি এটাও জানতেন যে, বনি উমাইয়াদের বিশাল ও ভয়ংকার যোদ্ধা বাহিনীর দ্বারা তাকে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন করা হবে । অথচ, ইয়াযিদের ঐ বাহিনী ছিল সাধারণ মুসলমানদের, বিশেষ করে ইরাকী জনগণেরই সমর্থনপুষ্ট । কেননা, সে যুগের সাধারণ মুসলমানদের বেশীর ভাগই গণদূর্নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলতা এবং চিন্তা ও চেতনাগত অধঃপতনে নিমজ্জিত ছিল ।

শুধুমাত্র সে যুগের অল্প ক'জন গণ্যমান্য ব্যক্তি হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর শুভাকাংখী হিসাবে ইরাক অভিমুখে যাত্রার ব্যাপারে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন । তারা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর ঐ যাত্রা ও আন্দোলনের বিপজ্জনক পরিণতির কথা তাকে "স্মরণ করিয়ে দেন । কিন্তু তাদের প্রতিবাদের উত্তরে ইমাম হুসাইন (আ.) বলেন, "আমি কোন অবস্থাতেই ইয়াযিদের বশ্যতা শিকার করব না । অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠিকে আমি কোন ক্রমেই সমর্থন করব না । আমি যেখানেই যাই না কেন, অথবা যেখানেই থাকি না কেন, তারা আমাকে হত্যা করবেই । আমি এ মূহুর্তে মক্কা নগরী এ কারণেই ত্যাগ করছি যে, রক্তপাত ঘটার মাধ্যমে আল্লাহর ঘরের পবিত্রতা যেন ক্ষুন্ন না হয় ।[২৭]

অতঃপর ইমাম হুসাইন (আ.) ইরাকের 'কুফা' শহরের অভিমুখে রওনা হন । 'কুফা' শহরে পৌছাতে তখনও বেশ ক'দিনের পথ বাকী ছিল । এমন সময় পথিমধ্যে তার কাছে খবর পৌছাল যে, ইয়াযিদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত 'কুফার' প্রশাসক ইমাম হুসাইন (আ.)- এর প্রেরিত বিশেষ প্রতিনিধিকে হত্যা করেছে । একই সাথে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর জনৈক জোরালো সমর্থক এবং

‘কুফা’ শহরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকেও হত্যা করা হয়েছে । এমনকি হত্যার পর তাদের পায়ে রশি বেধে ‘কুফা’ শহরের সকল বাজার এবং অলি গলিতে টেনে হিছড়ে বেড়ানো হয়েছে ।[২৮] এছাড়াও সমগ্র ‘কুফা’ শহর ও তার পার্শ্বস্থ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে । অসংখ্য শত্রু সৈন্য ইমাম হুসাইন (আ.)- এর আগমনের প্রতিক্ষায় দিন কাটাচ্ছে । সুতরাং শত্রু হস্তে নিহত হওয়া ছাড়া ইমাম হুসাইন (আ.)- এর জন্যে আর কোন পথই বাকী রইল না । তখন সবকিছু জানার পর ইমাম সুদৃঢ় ও দ্বিধাহীনভাবে শাহাদত বরণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ‘কুফা’র পথে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন ।[২৯]

‘কুফা’ পৌছার প্রায় ৭০ কিঃ মিঃ পূর্বে ‘কারবালা’ নামক মরুভুমিতে ইমাম পৌছলেন । তখনই ইয়াযিদের সেনাবাহিনী ইমাম হুসাইন (আ.)- কে ঐ মরু প্রান্তরে ঘেরাও করে ফেললো । ইয়াযিদ বাহিনী আটদিন পর্যন্ত ইমাম হুসাইন (আ.) ও তার সহচরদের সেখানে ঘেরাও করে রাখল । প্রতিদিনই তাদের ঘেরাওকৃত বৃত্তের পরিসীমা সংকীর্ণ হতে থাকে । আর শত্রু সৈন্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল । অবশেষে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) তার স্বীয় পরিবারবর্গ ও অতি নগণ্য সংখ্যক সহচরসহ তিরিশ হাজার যুদ্ধাংদেহী সেনাবাহিনীর মাঝে ঘেরাও হলেন ।[৩০] হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) আটকাবস্থায় ঐ দিনগুলোতে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । নিজের সহচরদের মধ্যে শুদ্ধিঅভিযান চালান । রাতের বেলা তার সকল সঙ্গীদেরকে বৈঠকে সমবেত করেন । ঐ বৈঠকে সমবেতদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন : “মৃত্যু ও শাহাদত বরণ ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ নেই । আমি ছাড়া আর অন্য কারো সাথেই এদের (ইয়াযিদ বাহিনী) কোন কাজ নেই । আমি তোমাদের কাছ থেকে গৃহীত আমার প্রতি ‘বাইয়াত’ (আনুগত্যের শপথ) এ মূহুর্ত থেকে বাতিল বলে ঘোষণা করছি । তোমাদের যে কেউই ইচ্ছে করলে রাতের এ আধারে এ স্থান ত্যাগ করার মাধ্যমে এই ভয়ংকর মৃত্যু কুপ থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে পারে । ইমামের ঐ বক্তৃতার পর শিবিরের বাতি নিভিয়ে দেয়া হল । তখন পার্থিব উদ্দেশ্যে আগত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর অধিকাংশ সঙ্গীরাই রাতের আধারে ইমামের শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেল । যার ফলে হাতে গোনা ইমামের অল্পকিছু অনুরাগী এবং বনি হাশিম

গোত্রের অল্প ক'জন ছাড়া ইমামের আর কোন সঙ্গী বাকী রইল না । ইমামের ঐসব অবশিষ্ট সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ জন । অতঃপর ইমাম হুসাইন (আ.) পুনরায় তার অবশিষ্ট সঙ্গীদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে সমবেত করেন । সমবেত সঙ্গী ও হাশেমীয় গোত্রের আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) বলেন : আমি ছাড়া তোমাদের কারো সাথে এদের কোন কাজ নেই । তোমাদের যে কেউ ইচ্ছে করলে রাতের আধারে আশ্রয় গ্রহণের (পালিয়ে যাওয়া) মাধ্যমে নিজেকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার ।

কিন্তু এবার ইমামের অনুরাগী ভক্তরা একে একে সবাই দৃঢ় কন্ঠে জবাব দিল । তারা বললো, আমরা অবশ্যই সে সত্যের পথ থেকে বিমুখ হব না, যে পথের নেতা আপনি । আমরা কখনোই আপনার পবিত্র সহচর্য ত্যাগ করবো না । আমাদের হাতে যদি তলোয়ার থাকে, তাহলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত আপনার স্বার্থ রক্ষার্থে যুদ্ধ করে যাব ।[৩১]

ইমাম (আ.)- কে প্রদত্ত অবকাশের শেষ দিন ছিল মহররম মাসের ৯ তারিখ । আজ ইমাম হুসাইন (আ.) কে ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকারের (বাইয়াত) ঘোষণা প্রদান করতে হবে অথবা ইয়াযিদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হতে হবে । শত্রু বাহিনীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ইমামের জবাব চেয়ে পাঠানো হল । প্রত্যুত্তরে ইমাম (আ.) ঐ রাতে (৯ই মহররমের দিবাগত রাত) সময় টুকু শেষ বারের মত ইবাদত করার জন্যে অবসর প্রদানের আবেদন করলেন । আর পর দিন ইয়াযিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতির্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ।[৩২]

হিজরী ৬১ সনের ১০ই মহররম আশুরার দিন, ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৯০জনের চেয়েও কম । যাদের মধ্যে ৪০ জনই ইমামের পুরনো সঙ্গী । আর আনুমানিক ৩০জনেরও কিছু বেশী সৈন্য এক'দিনে (১লা মহররম থেকে ১০ই মহররম পর্যন্ত) ইয়াযিদের বাহিনী ত্যাগ করে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর বাহিনীতে যোগদান করেছেন । আর অবশিষ্টরা ইমামের হাশেমী বংশীয় আত্মীয় স্বজন, ইমামের ভাই বোনরা ও তাদের সন্তানগণ, চাচাদের সন্তানগণ এবং তার নিজের পরিবারবর্গ । ইয়াযিদের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলায় ইমাম হুসাইন (আ.) তার ঐ অতি নগন্য সংখ্যক সদস্যের ক্ষুদ্র বাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে বিন্যস্ত করলেন ।

অতঃপর যুদ্ধ শুরু হল । সেদিন আশুরার সকাল থেকে শুরু করে সারাদিন যুদ্ধ চললো । ইমামের হাশেমী বংশীয় সকল যুবকই একের পর এক শাহাদত বরণ করলেন । ইমামের অন্যান্য সাথীরা একের পর এক সবাই শহীদ হয়ে গেলেন । ঐ সকল শাহাদত প্রাপ্তদের মাঝে ইমাম হাসান (আ.)- এর দু'জন কিশোর পুত্র এবং স্বীয় ইমাম হুসাইন (আ.)- এর একজন নাবালক পুত্র ও একটি দুগ্ধ পোষ্য শিশু ছিলেন ।[৩৩] যুদ্ধ শেষে ইয়াযিদ বাহিনী ইমাম হুসাইন (আ.)- এর পরিবারের মহিলাদের শিবির লুটপাট করার পর তাদের তাবুগুলোতে অগ্নি সংযোগ করে তা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় । তারা ইমামের বাহিনীর শহীদদের মাথা কটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে । শহীদদের লাশগুলোকে তারা বিবস্ত্র করে । দাফন না করেই তারা লাশগুলোকে বিবস্ত্র অবস্থায় মাটিতে ফেলে রাখে । এরপর ইয়াযিদ বাহিনী শহীদদের কর্তিত মস্তকসহ ইমাম পরিবারের বন্দী অসহায় নারী ও কন্যাদের সাথে নিয়ে কুফা শহরের দিকে রওনা হল । ঐসব বন্দীদের মাঝে ইমাম পরিবারের পুরুষ সদস্যের সংখ্যা ছিল মাত্র অল্প ক'জন । এদের একজন ছিলেন চরমভাবে অসুস্থ তিনি হলেন, হযরত ইমাম হুসাইনের ২২ বছর বয়স্ক পুত্র হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) । ইনিই সেই চতুর্থ ইমাম । অন্য একজন ছিলেন ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.)- এর ৪ বছর বয়স্ক পুত্র মুহাম্মদ বিন আলী । ইনিই হলেন পঞ্চম ইমাম হযরত বাকের (আ.) । আর তৃতীয় জন হলেন, হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর জামাতা এবং হযরত ইমাম হাসান (আ.)- এর পুত্র হযরত হাসান মুসান্না (রহঃ) । তিনি চরমভাবে আহত অবস্থায় শহীদদের লাশের মাঝে পড়ে ছিলেন । তখনও তার শ্বাসক্রিয়া চলছিল । শহীদদের মাথা কাটার সময় ইয়াযিদ বাহিনীর জনৈক সেনাপতির নির্দেশে তার মাথা আর কাটা হয়নি । অতঃপর তাকেও সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে বন্দীদের সাথে কুফার দিকে নিয়ে যাওয়া হল । তারপর কুফা থেকে সকল বন্দীকে দামেস্কে ইয়াযিদের দরবারের নিয়ে যাওয়া হয় ।

ইমাম পরিবারের নারী ও কন্যাদেরকে বন্দী অবস্থায় এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুড়িয়ে বেড়ানো হয় । পথিমধ্যে আমিরুল মু'মিনীন ইমাম আলী (আ.)- এর কন্যা হযরত জয়নাব (আ.) ও ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) জনগণের উদ্দেশ্যে কারবালার ঐ মর্মান্তিক ঘটনার ভয়াবহ বর্ণনা

সম্বলিত মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন । কুফা ও দামেস্কে তাদের প্রদত্ত ঐ হৃদয়বিদারক গণভাষণ উমাইয়াদেরকে জনসমক্ষে যথেষ্ট অপদস্থ করে । যার ফলে মুয়াবিয়ার বহু বছরের অপপ্রচারের পাহাড় মূহুর্তেই ধুলিসাৎ হয়ে যায় । এমনকি শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাড়ালো যে, ইয়াযিদ তার অধীনস্থদের এহেন ন্যক্কারজনক কার্যকলাপের জন্যে বাহ্যিকভাবে জনসমক্ষে অসন্তুষ্টি প্রকাশে বাধ্য হয়েছিল । কারবালার ঐ ঐতিহাসিক মর্মান্তিক ঘটনা এতই শক্তিশালী ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে তারই প্রভাবে উমাইয়া গোষ্ঠি তাদের শাসনক্ষমতা থেকে চিরতরে উৎখাত হয়ে যায় । ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনাই শীয়া সম্প্রদায়ের মূলকে অধিকতর শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে । শুধু তাই নয়, কারবালার ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একের পর এক বিদ্রোহ, বিপ্লব এবং ছোট বড় অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংঘাত ঘটতে থাকে । এ অবস্থা প্রায় বার বছর যাবৎ অব্যাহত ছিল । শেষ পর্যন্ত ইমাম হুসাইন (আ.)- কে হত্যা করার সাথে জড়িত একটি ব্যক্তিও জনগণের প্রতিশোধের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়নি ।

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর জীবন ইতিহাস, ইয়াযিদ এবং তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান রয়েছে, তিনি নিঃসন্দেহে জানেন যে, সে দিন হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর সামনে শুধুমাত্র একটা পথই খোলা ছিল । আর তা ছিল শাহাদত বরণ । কেননা, ইয়াযিদের কাছে বাইয়াত প্রদান, প্রকাশ্যভাবে ইসলামকে পদদলিত করারই নামান্তর । তাই ঐ কাজটি ইমামের জন্যে আদৌ সম্ভব ছিল না । কারণ, ইয়াযিদ যে শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী আইন কানুনকে সম্মান করত না, তাই নয়; বরং সে ছিল উচ্ছৃংখল চরিত্রের অধিকারী । এমনকি ইসলামের পবিত্র বিষয়গুলো এবং ইসলামী বিধানকে প্রকাশ্যে পদদলিত করার মত স্পর্ধাও সে প্রদর্শন করত । অথচ, ইয়াযিদের পূর্ব পুরুষরা ইসলামের বিরোধী থাকলেও তারা ইসলামী পরিচ্ছদের অন্তরালে ইসলামের বিরোধীতা করত । কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তারা ইসলামকে সম্মান করত । তারা প্রকাশ্যে মহানবী (সা.)- কে সহযোগিতা করত এবং ইসলামের গণ্যমান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বাহ্যত গর্ববোধ করত । কারবালার ইতিহাসের অন্য বিশ্লেষকই বলে থাকেন যে, ঐ দুই ইমামের [ইমাম হাসান (আ.) ও

ইমাম হুসাইন (আ.)] মতাদর্শ ছিল দু'ধরণের যেমন : ইমাম হাসান (আ.) প্রায় ৪০ হাজার সেনাবাহিনীর অধিকারী হয়েও মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি করেন । আর ইমাম হুসাইন (আ.) মাত্র ৪০ জন অনুসারী নিয়েই ইয়াযিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে: অবতির্ণ হন । কিন্তু ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরণের মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কারণ, ইমাম হুসাইন (আ.), যিনি মাত্র একটি দিনের জন্যেও ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকার করেননি, সেই তিনিই ইমাম হাসান (আ.)- এর পরপর দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ মুয়াবিয়ার শাসনাধীনে সন্ধিকালীন জীবন যাপন করেন । ঐ সময় তিনি প্রকাশ্যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ করেননি । প্রকৃতপক্ষে, ইমাম হাসান (আ.) এবং ইমাম হুসাইন (আ.) যদি সেদিন মুয়াবিয়ার সংগে যুদ্ধে অবতির্ণ হতেন, তাহলে অবশ্যই তারা নিহত হতেন । আর এর ফলে ইসলামের এক বিন্দু মাত্র উপকারও হত না । কেননা, মুয়াবিয়ার কপটতাপূর্ণ রাজনীতির কারণে, বাহ্যত তাকেই সত্য পথের অনুসারী বলে মনে হত । এছাড়া মুয়াবিয়া নিজেকে রাসূল (সা.)- এর সাহাবী, 'ওহী' লেখক এবং মু'মিনদের মামা (মুয়াবিয়ার জনৈকা বোন রাসূলের স্ত্রী ছিলেন) হিসেবে জনসমক্ষে প্রচার করে বেড়াত । আপন স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজনে এমন কোন চক্রান্ত নেই যা সে অবলম্বন করেনি । এমতাবস্থায় মুয়াবিয়ার এহেন প্রতারণামূলক রাজনীতির মোকাবিলায় ইমাম হাসান (আ.) বা ইমাম হুসাইন (আ.)- এর কোন কর্মসূচীই ফলপ্রসূ হত না ।

মুয়াবিয়া এতই চতুর ছিল যে, সে অতি সহজেই লোক লাগিয়ে ইমামদের হত্যা করত । আর সে নিজেই নিহত ইমামদের জন্যে প্রকাশ্যে শোক অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দিত । কেননা, একই কর্মসূচী সে তৃতীয় খলিফার ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত করেছিল ।

চতুর্থ ইমাম

হযরত আলী বিন হুসাইন (আ.)

তৃতীয় ইমাম হুসাইন (আ.)- এর পুত্র হযরত আলী বিন হুসাইন (আ.) হলেন চতুর্থ ইমাম । তার প্রসিদ্ধ উপাধি হল 'সাজ্জাদ' ও জয়নুল আবেদীন । আর এ দুটো নামেই (উপাধি) তিনি অধিক পরিচিত । তার মা হলেন ইরানের ইয়াযদগের্দের রাজকন্যা । হযরত ইমাম সাজ্জাদই (আ.) ছিলেন ইমাম হুসাইন (আ.)- এর একমাত্র জীবিত পুত্র । কারণ, ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- এর অন্য তিন ভাই কারবালায় শাহাদৎ বরণ করেন ।[৩৪]

অবশ্য হযরত ইমাম সাজ্জাদ (আ.)- ও পিতার সাথে কারবালায় উপস্থিত ছিলেন । কিন্তু তিনি সেখানে ভীষণভাবে অসুস্থ ছিলেন । যার ফলে অস্ত্র বহন বা যুদ্ধ করার মত দৈহিক সামর্থ তখন তার মোটেই ছিল না । তাই তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ বা শাহাদত বরণ করতে পারেননি । যুদ্ধশেষে ইমাম পরিবারের নারী ও কন্যাদের সাথে বন্দী অবস্থায় তাকে দামেস্কে পাঠানো হয় । তারপর সেখানে কিছুদিন বন্দী জীবন কাটানোর পর গণসন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইয়াযিদের নির্দেশে সসম্মানে তাকে মদীনায় পাঠানো হয় । পরবর্তীতে 'আব্দুল মালেক' নামক জনৈক উমাইয়া খলিফার নির্দেশে চতুর্থ ইমামকে পুনরায় বন্দী করে শিকল দিয়ে হাত পা বেধে দামেস্কে পাঠানো হয় । অবশ্য দামেস্ক থেকে আবার তাকে মদীনায় ফেরৎ পাঠানো হয় ।[৩৫]

চতুর্থ ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (আ.) মদীনায় ফেরার পর ঘরকুণো জীবন যাপন করতে শুরু করেন । অপরিচিতদেরকে সাক্ষাত প্রদান থেকে তিনি বিরত থাকেন । তখন থেকেই সর্বক্ষণ তিনি নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে ব্যস্ত রাখেন । হযরত আবু হামজা সামালী (রা.) ও হযরত আবু খালেদ কাবুলীর (রা.) মত বিশিষ্ট শীয়া ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সাথেই তিনি যোগাযোগ করতেন না । ইমামের ঐ বিশিষ্ট সাহাবীরা তার কাছ থেকে যেসব জ্ঞান আরহণ করতেন, তা তারা শীয়াদের মধ্যেই বিতরণ করতেন । এভাবে শীয়া মতাদর্শের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে । আর এর প্রভাব পরবর্তীতে পঞ্চম ইমামের যুগে প্রকাশিত হয় । 'সাহিফাতুস সাজ্জাদিয়াহ'

নামক চতুর্থ ইমামের দোয়ার সংকলন তার অবদান সমূহের অন্যতম । এই ঐতিহাসিক দোয়ার গ্রন্থটিতে ৫৭টি দোয়া রয়েছে । যার মধ্যে ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান রয়েছে । এই গ্রন্থ কে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতের 'যাবুর' (হযরত দাউদের (আ.) কাছে অবতির্ণ ঐশী গন্থ) বলে অভিহিত করা হয় । বেশকিছু শীয়া সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) ৩৫ বছর যাবৎ ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন । এরপর উমাইয়া খলিফা হিশামের প্ররোচণায় 'ওয়লিদ। ইবনে আব্দুল মালেক' নামক জনৈক ব্যক্তি বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইমাম (আ.)- কে হত্যা করে ।[৩৬] এভাবে হিজরী ৯৫ সনে ইমাম জয়নুল আবেদীন (আ.) শাহাদত বরণ করেন ।

পঞ্চম ইমাম

ইমাম বাকের (আ.)

হযরত মুহাম্মাদ বিন আলী ওরফে বাকের (আ.) হলেন পঞ্চম ইমাম । 'বাকের' অর্থ পরিস্ফুটনকারী । মহানবী (সা.) স্বয়ং তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন ।[৩৭] তিনি ছিলেন চতুর্থ ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (আ.)- এর পুত্র । তিনি হিজরী ৫৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন । ঐতিহাসিক কারবালার ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র চার বছর । কারবালায় তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ব পুরুষদের ওসিয়তের মাধ্যমে তিনি ইমামতের আসনে সমাসীন হন ।

হিজরী ১১৪ অথবা ১১৭ সনে (কিছু শীয় বর্ণনা অনুযায়ী) উমাইয়া খলিফা হিশামের ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহীম বিন ওয়লিদ বিন আব্দুল মালেকের দ্বারা বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[৩৮]

পঞ্চম ইমামের যুগে ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিন গণঅভ্যুত্থান ও যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে । এমনকি স্বয়ং উমাইয়া পরিবারের মধ্যেও মতভেদ শুরু হয় । এ সব সমস্যা উমাইয়া প্রশাসনকে এতই ব্যস্ত রাখে যে, পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) প্রতি সদাসতর্ক দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ তাদের তেমন একটা হয়ে উঠতো না । যার ফলে পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) প্রতি তাদের অত্যাচারের মাত্রা অনেকটা কমে যায় । এছাড়া কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা এবং পবিত্র আহলে বাইতগণের (আ.) নির্যাতিত অবস্থা জনগণের হৃদয়ের আবেগ অনুভুতিকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করেছিল । আর চতুর্থ ইমাম ছিলেন কারবালার সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার অন্যতম সাক্ষী । এর ফলে ক্রমেই মুসলমানরা পবিত্র আহলে বাইতগণের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়ে পড়েন । এ সব কারণে, পঞ্চম ইমামের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মদীনায় জনগণ এবং বিশেষ করে শীয়াদের গণস্রোতের ঢল নামে । যার ফলে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান ও পবিত্র আহলে বাইতের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ব্যাপক সুযোগ ইমাম বাকের (আ.)- এর জন্যে সৃষ্টি হয় । এমনকি তার পূর্ববতী ইমামগণের (আ.) জীবনেও এমন সুবর্ণ সুযোগ কখনও আসেনি । এ যাবৎ প্রাপ্ত অসংখ্য হাদীসই এ বক্তব্যের উত্তম সাক্ষী । শীয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী, পণ্ডিত ও ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ অসংখ্য বিখ্যাত আলেমই হযরত ইমাম বাকেরর (আ.) পবিত্র জ্ঞান নিকেতনে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়েছেন । ঐসব বিশ্ববিখ্যাত আলেম ও পণ্ডিতগণের পূর্ণ পরিচিতি ‘রিজাল’ (ইসলামী ঐতিহাসিক জ্ঞানী গুণীদের পরিচিতি শাস্ত্র) শাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত আছে ।[৩৯]

ষষ্ঠ ইমাম

ইমাম জাফর আস্ সাদেক (আ.)

পঞ্চম ইমামের পুত্র হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ আস্ সাদেক (আ.) ছিলেন ষষ্ঠ ইমাম । তিনি হিজরী ৮৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি হিজরী ১৪৮ সনে (শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুসারে) আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের চক্রান্তে বিষ প্রয়োগের ফলে শাহাদত বরণ করেন ।[৪০] ষষ্ঠ ইমামের ইমামতের যুগে তদানিন্তন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একের পর এক উমাইয়া শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল । ঐসবের মধ্যে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠিকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে 'মুসাওয়াদাহু' বিদ্রোহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কেননা, ঐ বিদ্রোহের মাধ্যমেই উমাইয়া শাসকগোষ্ঠি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাচ্যুত হয় । এছাড়াও ঐসময়ে সংঘটিত বেশকিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণ ঘটিয়েছিল । পঞ্চম ইমাম তার দীর্ঘ বিশ বছরের ইমামতের যুগে উমাইয়া খেলাফতের বিশৃংখল ও অরাজক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন । এর মাধ্যমে তিনি জনগণের মাঝে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান ও পবিত্র আহলে বাইতের পবিত্র শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করেন । এভাবে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া এবং তার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদেক (আ.)- এর জন্যে এক চমৎকার ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় ।

ষষ্ঠ ইমামের ইমামতের যুগটি ছিল উমাইয়া খেলাফতের শেষ ও আব্বাসীয় খেলাফতের শুরুর সন্ধিক্ষণ । হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ঐ সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের প্রয়াস পান । ইসলামী ইতিহাসের অসংখ্য বিখ্যাত পণ্ডিত ও ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তার কাছেই প্রশিক্ষণপ প্রাপ্ত হয়েছেন । যাদের মধ্যে জনাব যরারাহ , মুহাম্মদ বিন মুসলিম, মুমিন তাক, হিশাম বিন হাকাম, আবান বিন তাগলুব, হিশাম বিন সালিম, হারিয, হিশাম কালবী নাসাবাহ, জাবের বিন হাইয়্যান সুফীর (রসায়নবিদ) নাম উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়াও আহলে সুন্নাতের অসংখ্য

বিখ্যাত আলেমগণও তার শিষ্যত্ব বরণের মাধ্যমে ইসলামী পাণ্ডিত্য অর্জন করেন । যাদের মধ্যে হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, কাযী সাকুনী, কাযী আব্দুল বাখতারী, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য, যারা ষষ্ঠ ইমামের শিষ্যত্ব বরণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদের মধ্যে ইতিহাস বিখ্যাত প্রায় ১৪ হাজার মুহাদ্দিস (হাদীস বিশারদ) ও ইসলামী পন্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য ।[৪১] হযরত ইমাম বাকের (আ.) ও হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- এর দ্বারা বর্ণিত হাদীস সমূহের পরিমাণ, মহানবী এবং অন্য দশ ইমামের বর্ণিত হাদীসসমূহের চেয়ে অনেক বেশী ।

কিন্তু হযরত জাফর সাদেক (আ.) তাঁর ইমামতের শেষ পর্বে এসে আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের কু- দৃষ্টির শিকার হন । খলিফা মানসুর তাকে সদা কড়া পাহারা, নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতার মাঝে বসবাস করতে বাধ্য করেন । আব্বাসীয় খলিফা মানসুর নবীবংশের সাইয়্যেদ বা আলাভীদের উপর অসহ্য নির্যাতন চালাতে শুরু করেন । তার ঐ নির্যাতনের মাত্রা উমাইয়া খলিফাদের নিষ্ঠুরতা ও বিবেকহীন স্পর্ধাকেও হার মানিয়ে দেয় । খলিফা মানসুরের নির্দেশে নবীবংশের লোকদের দলে দলে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হত । অন্ধকারাচ্ছান্ন জেলের মধ্যে তাদের উপর সম্পূর্ণ অমানবিকভাবে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয় । নির্যাতনের মাধ্যমে তিলেতিলে তাদের হত্যা করা হত । তাদের অনেকের শিরোচ্ছেদও করা হয়েছে । তাদের বহুজনকে আবার জীবন্ত কবর দেয়া হত । তাদের অনেকের দেহের উপর দেয়াল ও অট্রালিকা নির্মাণ করা হত ।

খলিফা মানসুর হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)- কে মদীনা ত্যাগ করে তার কাছে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জারী করে । অবশ্য হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ইতিপূর্বে একবার আব্বাসীয় খলিফা সাফফাহ- র নির্দেশে তার দরবারের উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন । এছাড়াও তার পিতার (পঞ্চম ইমাম) সাথে একবার উমাইয়া খলিফা হিশামের দরবারের তাকে উপস্থিত হতে হয়েছিল । খলিফা মানসুর বেশ কিছুকাল যাবৎ ষষ্ঠ ইমামকে কড়া পাহারার মাঝে নজরবন্দী করে রাখেন । খলিফা মানসুর বহুবার ইমামকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল । সে ইমামকে বহুবারই অপদস্থ করেছিল । অবশেষে সে ইমামকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয় । ইমাম

মদীনায় ফিরে যান । ইমাম তার জীবনের বাকী সময়টুকু অত্যন্ত কঠিন 'তাকীয়ার' মাঝে অতিবাহিত করেন । তখন থেকে তিনি স্বেচ্ছায় গণসংযোগবিহীন ঘরকুণো জীবন যাপন করতে শুরু করেন । এরপর এক সময় খলিফা মানসুরের ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইমামকে শহীদ করা হয় ।[৪২]

মানসুর ষষ্ঠ ইমামের শাহাদতের সংবাদ পেয়ে মদীনার প্রশাসককে চিঠি মারফৎ একটি নির্দেশ পাঠালো । ঐ লিখিত নির্দেশে বলা হয়েছে, মদীনার প্রশাসক ষষ্ঠ ইমামের শোকার্ত পরিবারের প্রতি সান্তনা জ্ঞাপনের জন্যে যেন তাঁর বাড়িতে যায় । অতঃপর সে যেন ইমামের ওসিয়ত নামা' (উইল) তার পরিবারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তা পড়ে দেখে । ইমামের 'ওসিয়ত নামায়' যাকে তার পরবর্তী ইমাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাকে (পরবর্তী ইমাম) যেন তৎক্ষণাৎ সেখানেই শিরোচ্ছেদ করা হয় । এই নির্দেশ জারীর ব্যাপারে মানসুরের মূল উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে ইমামতের বিষয়টি চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়া । কেননা এর ফলে শীয়াদের প্রাণ প্রদীপ চিরতরে নিভে যাবে । খলিফার নির্দেশ অনুসারে মদীনার প্রশাসক ইমামের বাড়িতে গিয়ে তার 'ওসিয়ত নামা' চেয়ে নেয় । কিন্তু তা পড়ার পর সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে । কারণ, ঐ 'ওসিয়ত নামায়' ইমাম পাঁচ ব্যক্তিকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত ও ঘোষণা করেছেন । ঐ পাঁচ ব্যক্তি হচ্ছেন : স্বয়ং মানসুর, মদীনার প্রশাসক, ইমামের সন্তান আব্দুল্লাহ আফতাহ্, ইমামের ছোট ছেলে মুসা কাজেম এবং হামিদাহ । এ ধরণের অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে খলিফার সকল ষড়যন্ত্র ধুলিষ্যাৎ হয়ে গেল ।[৪৩]

সপ্তম ইমাম

ইমাম কাযেম (আ.)

ষষ্ঠ ইমামের পুত্র হযরত মুসা বিন জাফরই (কাযিম) (আ.) ছিলেন সপ্তম ইমাম । তিনি হিজরী ১২৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হিজরী ১৮৩ সনে জেলে বন্দী অবস্থায় বিষ প্রয়োগের ফলে শাহাদত বরণ করেন ।[৪৪] পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ববতী ইমামগণের ওসিয়ত অনুযায়ী ইমামতের পদে আসীন হন । সপ্তম ইমাম হযরত মুসা কাযিম (আ.) আব্বাসীয় খলিফা মানসুর, হাদী, মাহদী, এবং হারুনুর রশিদের সমসাময়িক যুগে বাস করতেন । তার ইমামতের কালটি ছিল অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছান্ন ও সুকঠিন যার ফলে 'তাকিয়া' নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তার জীবনকাল অতিবাহিত হয় । অবশেষে খলিফা হারুনুর রশিদ হজ্জ উপলক্ষ্যে মদীনায় গিয়ে ইমামকে বন্দী করে । খলিফা হারুনের নির্দেশে 'মসজিদে নববীতে' নামাযরত অবস্থায় ইমামকে গ্রেপ্তার ও শিকল পরানো হয় । শিকল পরানো অবস্থাই ইমামকে মদীনা থেকে বসরায় এবং পরে বাগদাদে বন্দী হিসেবে স্থানান্তর করা হয় । ইমামকে বহু বছর একাধারে জেলে বন্দী অবস্থায় রাখা হয় । এসময় তাকে একের পর এক বিভিন্ন জেলে স্থানান্তর করা হয় । অবশেষে 'সিন্দি ইবনে শাহেক' নামক বাগদাদের এক জেলে বিষ প্রয়োগের ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[৪৫] অতঃপর 'মাকাবিরে কুরাইশ' নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয় । ঐ স্থানের বর্তমান নাম 'কাযেমাইন' নগরী ।

অষ্টম ইমাম

ইমাম আলী বিন মুসা আর রেযা (আ.)

সপ্তম ইমামের পুত্র হযরত আলী বিন মুসা আর রেযা (আ.)- ই হলেন অষ্টম ইমাম । তিনি হিজরী ১৪৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ২০৩ সনে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[৪৬] পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে ও পূর্ববতী ইমামদের নির্দেশনায় তিনি ইমামতের আসনে সমাসীন

হন । আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদের পুত্র খলিফা আমিনের এবং তার অন্য আর এক পুত্র খলিফা মামুনুর রশিদের শাসনামলেই অষ্টম ইমামের ইমামতকাল অতিবাহিত হয় । পিতার মৃত্যুর পর মামুনুর রশিদের সাথে তার ভাই খলিফা আমিনের মতভেদ শুরু হয় । তাদের ঐ মতভেদ শেষ পর্যন্ত একাধিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায় । অবশেষে খলিফা আমিনের নিহত হওয়ার মাধ্যমে ঐ সব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে । আর এর ফলে মামুনুর রশিদ খেলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করতে সমর্থ হয় ।[৪৭] মামুনুর রশিদের যুগ পর্যন্ত 'আলাভী' (রাসূল বংশের লোক) সৈয়দদের ব্যাপারে আব্বাসীয় খেলাফত প্রশাসনের নীতি ছিল আক্রোশমূলক ও রক্তলোলুপ । নবীবংশের প্রতি তাদের গৃহীত ঐ হিংসাত্মক নীতি দিনদিন কঠোরতর হতে থাকে । তৎকালীন রাজ্যের কোথাও কোন 'আলাভী' (নবীবংশের লোক) বিদ্রোহ করলেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও মহাবিশৃংখলার সৃষ্টি হত । যে বিষয়টি স্বয়ং রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের জন্যেও এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করত । পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ ঐসব আন্দোলন ও বিদ্রোহের ব্যাপারে আদৌ কোন সহযোগিতা বা হস্তক্ষেপ করতেন না । সেসময় আহলে বাইতের অনুসারী শীয়া জনসংখ্যা ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয় । নবীবংশের ইমামগণকে (আ.) তারা তাদের অবশ্য অনুকরণীয় দ্বীনি নেতা এবং মহানবী (সা.)- এর প্রকৃত প্রতিনিধি বা খলিফা হিসেবে বিশ্বাস করত । সেযুগে খেলাফত প্রশাসন কায়সার ও কায়সার রাজ দরবার সদৃশ্য ছিল । ঐ খেলাফত প্রশাসন তখন মুষ্টিমেয় চরিত্রহীন লোকদের দ্বারা পরিচালিত হত । শীয়াদের দৃষ্টিতে তা ছিল এক অপবিত্র প্রশাসন যা তাদের ইমামদের পবিত্রাংগন থেকে ছিল অনেক দূরে । এ ধরণের পরিবেশের অগ্রগতি খেলাফত প্রশাসনের জন্যে ছিল বিপদজনক এক প্রতিবন্ধক, যা খেলাফতকে প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন করছিল । ঐ ধরণের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে খেলাফত প্রশাসনকে উদ্ধারের জন্যে খলিফা মামুনুর রশিদ ভীষণভাবে চিন্তিত হল । খলিফা মামুন লক্ষ্য করল, ৭০ বছর যাবৎ আব্বাসীয় খেলাফত মরচে পড়া ঐ রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে ব্যর্থতারই প্রমাণ দিয়েছে । বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা ঐ রাজনীতি সংস্কারের মধ্যেই সে ঐ দূরাবস্থার চির অবসান খুজে পেল । তার গৃহীত নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে অষ্টম ইমাম হযরত রেজা (আ.)- কে

তার খেলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করে । এই ঘোষণার মাধ্যমে সে খেলাফতের পথকে সম্পূর্ণরূপে কন্টকমুক্ত করতে চেয়েছিল । কেননা, নবীবংশের সৈয়দগণ যখন রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের সাথে জড়িত হয়ে পড়বেন, তখন খেলাফতের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের বিদ্রোহ থেকেই তারা বিরত থাকবেন ।

আর আহলে বাইতের অনুসারী শীয়াগণ তখন তাদের ইমামকে খেলাফত প্রশাসনের মাধ্যমে অপবিত্র হতে দেখবে, যে প্রশাসনের পরিচালকদের এক সময় অপবিত্র বলে বিশ্বাস করত । তখন আহলে বাইতের ইমামদের প্রতি শীয়াদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও পরম ভক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাবে । এভাবে তাদের ধর্মীয় সাংগঠনিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে ।[৪৮] এর ফলে রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের সামনে কোন প্রতিবন্ধকতাই আর অবশিষ্ট থাকবে না । আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে, উদ্দেশ্য চারিতার্থের পর ইমাম রেজা (আ.)- কে তার পথের সামনে থেকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দেয়া খলিফা মামুনের জন্যে কোন কঠিন কাজই নয় । মামুনের ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হযরত ইমাম রেজা (আ.)- কে মদীনা থেকে 'মারওয়' নামক স্থানে নিয়ে আসে । ইমামের সাথে প্রথম বৈঠকেই মামুন তাকে খেলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণের প্রস্তাব দেয় । এরপর সে ইমামকে তার মৃত্যুর পর খেলাফতের উত্তাধিকারী হবার প্রস্তাব দেয় । কিন্তু ইমাম রেজা (আ.) মামুনের ঐ প্রস্তাব সম্মানের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন । কিন্তু মামুন চরমভাবে পীড়াপীড়ির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তার পরবর্তী খেলাফতের উত্তরাধিকার গ্রহণের ব্যাপারে সম্মত হতে ইমামকে বাধ্য করে । কিন্তু হযরত ইমাম রেজা (আ.) এই শর্তে মামুনের প্রস্তাবে সম্মত হন যে, ইমাম প্রশাসনিককারযে লোক নিয়োগ বা বহিস্কারসহ কোন ধরণের রাষ্ট্রিয় কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করবেন না ।[৪৯] এটা ছিল হিজরী ২০০সনের ঘটনা । কিছুদিন না যেতেই মামুন দেখতে পেল যে, শীয়াদের সংখ্যা পূর্বের চেয়েও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এমনকি ইমামের প্রতি সাধারণ জনগণের ভক্তি দিনদিন আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে । শুধু তাই নয়, মামুনের সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তিই ইমামের ভক্ত হয়ে পড়ছে । এ অবস্থাদৃষ্টে খলিফা মামুন তার রাজনৈতিক ভুল বুঝতে পারে । মামুন ঐ জটিল

সমস্যার সমাধান কল্পে ইমামকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করেন । শাহাদতের পর অষ্টম ইমামকে ইরানের 'তুস' নগরীতে (বর্তমানে মাশহাদ নামে পরিচিত) দাফন করা হয় । খলিফা মামুনুর রশিদ 'দর্শন' শাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদের ব্যাপারে অত্যন্ত আগহ দেখিয়ে ছিল । সে প্রায়ই জ্ঞান- বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যালোচনার বৈঠকের আয়োজন করত । সে যুগের বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞানী গুণী ও পণ্ডিতগণ তার ঐ বৈঠকে উপস্থিত হতেন এবং জ্ঞানমূলক আলোচনায় অংশ নিতেন । অষ্টম ইমাম হযরত রেজা (আ.)- ও ঐ বৈঠকে অংশ গ্রহণ করতেন । দেশ বিদেশের বিভিন্ন ধর্মের জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের সাথে পর্যালোচনা ও তর্কবিতর্কে তিনিও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন । ইমামের ঐসব জ্ঞানমূলক ঐতিহাসিক বিতর্ক অনুষ্ঠানের বর্ণনা শীয়াদের হাদীসসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে ।[৫০]

নবম ইমাম

ইমাম মুহাম্মদ বিন আলী আত তাকী (আ.)

অষ্টম ইমামের পুত্র হযরত মুহাম্মদ বিন আলী আত তাকী (আ.) হলেন নবম ইমাম । তিনি ইমাম যাওয়াদ এবং ইবনুর রেযা নামেও সম্যক পরিচিত । তিনি হিজরী ১৯৫ সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন । শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুসারে হিজরী ২২০ সনে আব্বাসীয় খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র প্ররোচনায় বিষ প্রয়োগের ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন । আব্বাসীয় খলিফা মামুনের কন্যা ছিল তার স্ত্রী । খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ্‌র প্ররোচনায় ইমামের স্ত্রী (খলিফা মামুনের কন্যা) ইমামকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করেন । বাগদাদের 'কাযেমাইন' এলাকায় দাদার (সপ্তম ইমাম) কবরের পাশেই তাকে কবরস্থ করা হয় । পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং পূর্ববতী ইমামগণের নির্দেশনায় তিনি ইমামতের পদে অধিষ্ঠিত হন । মহান পিতার মৃত্যুর সময় নবম ইমাম মদীনায় ছিলেন । আব্বাসীয় খলিফা মামুন তাকে বাগদাদে ডেকে পাঠায় । আব্বাসীয় খেলাফতের তৎকালীন রাজধানী ছিল বাগদাদ । খলিফা মামুন প্রকাশ্যে ইমামকে অত্যন্ত সম্মান

প্রদর্শন করে এবং তার সাথে নম্র ব্যাবহার করে । এমনকি খলিফা মামুন তার নিজ কন্যাকে ইমামের সাথে বিয়ে দেয় । এভাবে সে ইমামকে বাগদাদেই রেখে দেয় । প্রকৃতপক্ষে ঐ বিয়ের মাধ্যমে ইমামকে ঘরের ভিতরে এবং বাইরে উভয় দিক থেকেই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায় । ইমাম তাকী (আ.) বেশ কিছুদিন বাগদাদে কাটানোর পর খলিফা মামুনের অনুমতি নিয়ে মদীনায় ফিরে যান । তারপর খলিফা মামুনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই ছিলেন । খলিফা মামুনের মৃত্যুর পর মু'তাসিম বিল্লাহ খলিফার সিংহাসনে আরোহণ করেন । এরপরই খলিফা মু'তাসিম ইমামকে পুনরায় বাগদাদে ডেকে পাঠায় এবং তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয় । অতঃপর খলিফা মু'তাসিমের প্ররোচনায় ইমামের স্ত্রী (খলিফা মামুনের কন্যা) ইমামকে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে শহীদ করে ।[৫১]

দশম ইমাম

ইমাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আন্ নাকী (আ.)

নবম ইমামের পুত্র হযরত আলী ইবনে মুহাম্মদ আন্ নাকী (আ.)- ই হলেন দশম ইমাম । ইমাম হাদী নামেও তাকে ডাকা হত । তিনি হিজরী ২১২ সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন । শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী ২৫৪ হিজরী সনে আব্বাসীয় খলিফা মু'তায বিল্লাহর নির্দেশে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে শহীদ করা হয় ।[৫২] ইমাম নাকী (আ.) তার জীবদ্দশায় ৭জন আব্বাসীয় খলিফার (মামুন, মুতাসিম, ওয়াসিক, মুতাওয়াক্কিল, মুনতাসির, মুসতাঈন ও মুতায বিল্লাহ) শাসনামল প্রত্যক্ষ করেন । আব্বাসীয় খলিফা মুতাসিমের শাসনামলেই ইমাম নাকী (আ.)- এর মহান পিতা (নবম ইমাম) বিষ প্রয়োগের ফলে হিজরী ২২০ সনে বাগদাদে শাহাদত বরণ করেন । তখন তিনি (দশম ইমাম) মদীনায় অবস্থান করছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ববর্তী ইমামদের নির্দেশনায় তিনি ইমামতের পদে অভিষিক্ত হন । তিনি ইসলাম প্রচার ও তার শিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন । এরপর আব্বাসীয় খলিফা

মুতাওয়াক্কিলের শাসনামল শুরু হয় । ইতিমধ্যে অনেকেই ইমাম নাকী (আ.) সম্পর্কে খলিফার কান গরম করে তোলে । ফলে খলিফা মুতাওয়াক্কিল হিজরী ২৪৩ সনে তার দরবারের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে, ইমামকে মদীনা থেকে 'সামেররা' শহরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয় । 'সামেররা' শহর ছিল তৎকালীন আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী । খলিফা মুতাওয়াক্কিল অত্যন্ত সম্মানসূচক একটি পত্র ইমামের কাছে পাঠায় । পত্রে সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ইমামের সাক্ষাত লাভের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং ইমামকে দ্রুত 'সামেররা' শহরের দিকে রওনা হওয়ার জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ।[৫৩] কিন্তু 'সামেররা' শহরে প্রবেশের পর ইমামকে আদৌ কোন অভ্যর্থনা জানান হয়নি । বরং ইমামকে কষ্ট দেওয়া ও অবমাননা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুরই আয়োজন করা হয়েছিল । এ ব্যাপারে খলিফা বিন্দুমাত্র ত্রুটিও করেনি । এমনকি ইমামকে হত্যা এবং অবমাননা করার লক্ষ্যে বহুবার তাকে খলিফার রাজ দরবারের উপস্থিত করানো হত । খলিফার নির্দেশে বহুবার ইমামের ঘর তল্লাশী করা হয় ।

নবীবংশের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে মুতাওয়াক্কিলের জুড়ি মেলা ভার । খলিফা মুতাওয়াক্কিল হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর প্রতি মনে ভীষণ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করত । এমনকি হযরত ইমাম আলী (আ.)- এর ব্যাপারে প্রকাশ্যে সে অকথ্য মন্তব্য করত । খলিফা কৌতুক অভিনেতাকে বিলাস বহুল পোষাকে হযরত আলী (আ.)- এর অনুকরণমূলক ভঙ্গীতে তার (ইমাম আলী) প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক অভিনয় করার নির্দেশ দিত । আর ঐ দৃশ্য অবলোকন খলিফা চরমভাবে উল্লাসিত হত । হিজরী ২৩৭ সনে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের নির্দেশেই কারবালায় হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)- এর মাযার (রওজা শরীফ) এবং তদসংলগ্ন অসংখ্য ঘরবাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় । তার নির্দেশে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর মাযার এলাকায় পানি সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ইমামের মাযারের উপর চাষাবাদের কাজ শুরু করা হয় । যাতে করে ইমাম হুসাইন (আ.)- এর নাম এবং মাযারের ঠিকানা চিরতরে ইতিহাস থেকে মুছে যায় ।[৫৪] আব্বাসীয় খলিফা মুতাওয়াক্কিলের শাসন আমলে হেজাজে (বর্তমান সৌদি আরব) বসবাসকারী সাইয়্যেদদের (নবীবংশের লোকজন) দূর্দশা এতই চরম

পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় যে, তাদের স্ত্রীদের পরার মত বোরখাও পর্যন্ত ছিল না । অল্প ক'জনের জন্যে মাত্র একটি বোরখা ছিল, যা পরে তারা পালাক্রমে নামায পড়তেন ।[৫৫] শাসকগোষ্ঠির পক্ষ থেকে ঠিক এমনি ধরণের অত্যাচারমূলক কার্যক্রম মিশরে বসবাসকারী সাইয়্যেদদের (নবীবংশের লোকজন) উপরও করা হয় । দশম ইমাম খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সবধরণের অত্যাচার ও শাস্তিই অম্লান বদনে সহ্য করেন ।

এরপর একসময় খলিফা মুতাওয়াক্কিল মৃত্যুবরণ করে । মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যুর পর মুনতাসির, মুস্তাঈন ও মু'তায একের পর এক খেলাফতের পদে আসীন হয় । অবশেষে খলিফা মু'তাযের ষড়যন্ত্রে ইমামকে বিষ প্রয়োগ করা হয় এবং ইমাম শাহাদত বরণ করেন ।

একাদশ ইমাম

ইমাম হাসান বিন আলী আল আসকারী (আ.)

দশম ইমামের পুত্র হযরত হাসান বিন আলী আল আসকারী (আ.) হলেন একাদশ ইমাম । তিনি হিজরী ২৩২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন । শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুসারে হিজরী ২৬০ সনে আব্বাসীয় খলিফা মু'তামিদের দ্বারা বিষ প্রয়োগে তিনি শাহাদত বরণ করেন ।[৫৫]

পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর নির্দেশে এবং পূর্ববর্তী ইমামদের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি ইমামতের পদ লাভ করেন । তার ইমামতের মেয়াদকাল ছিল মাত্র সাত বছর । ইমাম আসকারী (আ.)- এর যুগে আব্বাসীয় খলিফার সীমাহীন নির্যাতনের কারণে অত্যন্ত কঠিন তাকীয়া নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয় । তিনি হাতে গোনা বিশিষ্ট ক'জন শীয়া ব্যতীত অন্য সকল সাধারণ শীয়াদের সাথে গণসংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হন । এরপরও তার ইমামত কালের অধিকাংশ সময় জেলে বন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে হয় ।[৫৬] রাষ্ট্রিয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরোপিত ঐ প্রচন্ড রাজনৈতিক চাপের মূল কারণ ছিল এই যে,

প্রথমত : সে সময় চারিদিকে শীয়াদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ছিল । শীয়ারা যে ইমামতে বিশ্বাসী এবং কে তাদের ইমাম, এটা তখন সবাই ভাল করেই জানত । এ কারণেই খেলাফতের পক্ষ থেকে ইমামদেরকে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয় । আর এসকল রহস্যময় পরিকল্পনার মাধ্যমে ইমামদেরকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তারা চালাত ।

দ্বিতীয়ত : খেলাফত প্রশাসন এটা জানতে পরেছিল যে, ইমামের অনুসারী বিশিষ্ট শীয়ারা ইমামের এক বিশেষ সন্তানের আগমনে বিশ্বাসী এবং তাঁর জন্যে প্রতীক্ষারত । এছাড়াও স্বয়ং একাদশ ইমাম এবং তার পূর্ববর্তী ইমামগণের (আ.) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী একাদশ ইমামের আসন্ন পুত্র সন্তানই সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) যার আগমনের সু সংবাদ স্বয়ং মহানবী (সা.)- ই দিয়েছেন । মহানবী (সা.)- এর ঐ সকল হাদীস শীয়া এবং সুন্নী উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে ।[৫৭] আর ঐ নবজাতকই হলেন ইমাম মাহদী (আ.) বা দ্বাদশ ইমাম । এ সকল কারণেই একাদশ ইমামকে খেলাফতের পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী যে কোন ইমামের তুলনায়ই অধিকতর কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয় । তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা এ ব্যাপারে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, ইমামতের এই বিষয়টিকে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করতে হবেই । ইমামতের এই দরজাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে । এ কারণেই যখন আব্বাসীয় খলিফা মু'তামিদ ইমামের অসুস্থ অবস্থার সংবাদ পেল, সাথে সাথেই সে ইমামের কাছে একজন ডাক্তার পাঠায় । ঐ ডাক্তারের সাথে খলিফার বেশ ক'জন বিশ্বস্থ অনুচরসহ ক'জন বিচারককেও ইমামের বাড়িতে পাঠানো হয় । এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তারা ইমামের বাড়ীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ও তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় । আর এটাই ছিল খলিফা মু'তামিদের মূল উদ্দেশ্য ইমামের শাহাদত বরণের পরও তার সমস্ত বাড়ী ঘরে তল্লাশী চালানো হয় । এমনকি ধাত্রীদের দিয়ে ইমামের বাড়ীর মহিলা ও তার দাসীদেরকেও দৈহিক পরীক্ষা করানো হয় । ইমামের শাহাদত বরণের পর প্রায় দু'বছর পর্যন্ত খলিফার নির্দেশে ইমামের সন্তানের অস্তিত্ব খুজে পাওয়ার জন্যে সর্বত্র ব্যাপক তল্লাশী অব্যাহত থাকে । দীর্ঘ দু'বছর পর

খলিফা ঐ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে ।[৫৮] শাহাদত বরণের পর 'সামেরা' শহরে নিজ গৃহে পিতার (দশম ইমাম) শিয়রে ইমাম আসকারীকে (আ.) দাফন করা হয় । পবিত্র আহ্‌লে বাইতের ইমামগণ তাদের জীবদ্দশায় অসংখ্য খ্যাতনামা আলেম ও হাদীস বিশারদ তৈরী করেছিলেন । যাদের সংখ্যা শতাধিক । এই বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ঐসব (ইমামদের শিষ্যবর্গ) বিশ্ববরেণ্য আলেমদের নাম ও তাদের রচিত গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখে বিরত থেকেছি।[৫৯]

দ্বাদশ ইমাম

ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

একাদশ ইমামের পুত্র হযরত মুহাম্মদ বিন হাসান আল্ মাহ্‌দী হলেন দ্বাদশ ইমাম । তিনি মাহ্‌দী মাওউদ, ইমামুল আসর এবং সাহেবুজ জামান নামে পরিচিত । হিজরী ২৫৫ অথবা ২৫৬ সনে ইরাকের 'সামেরা' শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন । পিতার শাহাদতের (২৬০ হিঃ) পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরাসরি পিতার তত্ত্বাবধানেই লালিত পালিত হন । অবশ্য ঐসময় তাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে বসবাস করতে হয় । শুধুমাত্র ইমামের অনুসারী অল্প ক'জন বিশিষ্ট শীয়া ব্যতীত তার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আর কারও ঘটেনি । পিতার (একাদশ ইমাম) শাহাদত প্রাপ্তির পর তিনি ইমামতের পদে অভিষিক্ত হন । কিন্তু তার পরপরই মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি আত্মগোপন করেন । দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত তার বিশেষ প্রতিনিধিবর্গ ছাড়া আর কারো নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি ।[৬০]

বিশেষ প্রতিনিধি

দ্বাদশ ইমাম হযরত মাহ্‌দী (আ.) আত্মগোপন করার পর জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীকে (রহঃ) নিজের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করেন । তিনি ইমামের দাদা (দশম ইমাম) ও বাবার (একাদশ ইমাম) বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । ব্যক্তিগত ভাবে ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বস্ত । জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীর (রহঃ) মাধ্যমেই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) শীয়া জনগণের প্রশ্নের উত্তর দিতেন । জনাব ওসমান বিন সাঈদ ওমারীর (রহঃ) মৃত্যুর পর তারই পুত্র মুহাম্মদ বিন ওসমান ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন । জনাব মুহাম্মদ বিন ওসমান ওমারীর মৃত্যুর পর জনাব আবুল কাসিম হুসাইন বিন রূহ্ আন নওবাখতি (রহঃ) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)- এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন । তার মৃত্যুর পর জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরী (রহঃ) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)- এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন । জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরী (রহঃ) হিজরী ৩২৯ সনে মৃত্যু বরণ করেন । তার মৃত্যুর অল্প ক'দিন পূর্বে ইমামের স্বাক্ষরসহ একটি নির্দেশ নামা জনাব আলী বিন মুহাম্মদ সামেরীর হাতে পৌছে । ঐ নির্দেশ লিপিতে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) তাকে বলেন যে, আর মাত্র ছয় দিন পরই তুমি এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিবে । তার পরপরই বিশেষ প্রতিনিধিত্বের যুগের অবসান ঘটবে এবং দীর্ঘকালীন অর্ন্তধানের যুগ শুরু হবে । মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইমাম মাহ্‌দীর আত্মপ্রকাশের নির্দেশনা আসা পর্যন্ত ঐ দীর্ঘ কালীন অর্ন্তধানের যুগ অব্যাহত থাকবে ।[৬১] ইমামের হস্তলিপি সম্পন্ন ঐ পত্রের বক্তব্য অনুসারে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)- এর অর্ন্তধানকালীন জীবনকে দু'টো পর্যায়ে ভাগ করা যায় ।

প্রথম : স্বল্পকালীন অর্ন্তধান । হিজরী ২৫০ সনে এই অর্ন্তধান শুরু হয় এবং হিজরী ৩২৯ সন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে । অর্থাৎ প্রায় ৭০ বছর পর্যন্ত এই অর্ন্তধান স্থায়ী ছিল ।

দ্বিতীয় : দীর্ঘকালীন অর্ন্তধান । হিজরী ৩২৯ সন থেকে এই অর্ন্তধান শুরু হয় এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছামত এই অর্ন্তধান অব্যাহত থাকবে । মহানবী (সা.)- এর একটি সর্বসম্মত হাদীসে বলা হয়েছে : এ বিশ্বজগত ধ্বংস হওয়ার জন্যে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই সে দিনটিকে এতখানি দীর্ঘায়িত করবেন, যাতে আমারই সন্তান মাহ্‌দী (আ.)

আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে ।[৬২]

ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাব

গণহেদায়েতের নীতি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে বলবৎ রয়েছে । সেই নীতির, অপরিহার্য ফলাফল স্বরূপ মানবজাতি 'ওহী' ও 'নবুয়তের' শক্তি সরঞ্জামে সুসজ্জিত । ঐ বিশেষ শক্তিই মানব জাতিকে মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করে । আর এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, আল্লাহ প্রদত্ত ঐ বিশেষ শক্তি যদি সামাজিক জীবন যাপনকারী মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করতেই না পারে, তাহলে ঐ বিশেষ শক্তির সরঞ্জাম মানবজাতিকে সুসজ্জিত করার মূলকাজটিই বৃথা বলে প্রমাণিত হবে । অথচ, এ সৃষ্টিজগতে বৃথা বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই । অন্যকথায় বলতে গেলে, মানব জাতি যেদিন থেকে এ জগতে জীবন যাপন করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই সে সৌভাগ্যপূর্ণ (সার্বিক অর্থে) এক সামাজিক জীবন যাপনের আকাংখা তার হৃদয়ে লালন করে আসছে । আর সেই কাংখিত লক্ষ্যে পৌছার জন্যেই সে প্রয়াজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে । তার হৃদয়ে ঐ আকাংখা সত্যিই যদি অবাস্তব হত, তাহলে নিশ্চয়ই সে ঐ আকাংখার স্বপ্নিল ছবি তার হৃদয় পটে আকতো না । অথচ, আবহমান কাল থেকে জগতের প্রতিটি মানুষই তার জীবনে এমন একটি আকাংখা হৃদয় কঠুরীতে লালন করে আসছে । যদি খাদ্যের অস্তিত্ব না থাকত তা হলে ক্ষুধার অস্তিত্ব থাকত না । পানির অস্তিত্বই যদি না থাকবে, তাহলে কিভাবে তৃষ্ণার অস্তিত্ব থাকতে পারে? যৌনাংগের অস্তিত্বই যদি না থাকত তা হলে যৌন কামনার অস্তিত্বও থাকত না । এ কারণেই বিশ্ব জগতে এমন এক দিনের আবির্ভাব ঘটবে, যখন মানব সমাজ সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়বিচার ভোগ করবে । সমগ্র বিশ্বে তখন শান্তি নেমে আসবে । সবাই শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করবে । তখন মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের মাঝে নিমিজ্জিত হবে । অবশ্য ঐ ধরণের পরিবেশ টিকিয়ে রাখার ব্যাপরটি তখন মানুষের উপরই নির্ভরশীল হবে । ঐধরণের সমাজের নেতৃত্ব দান করবে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা; হাদীসের

ভাষায় যার নাম হবে মাহদী (আ.) । পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্মেই বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে এবং সাধারণভাবে তার আবির্ভাবের সুসংবাদও প্রদান করা হয়েছে । যদিও ঐ বক্তব্যের বাস্তব প্রয়োগে কমবেশী মতভেদ রয়েছে । সর্বসম্মত হাদীসে মহানবী (সা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে বলেছেনঃ “প্রতিশ্রুত মাহদী আমারই সন্তান ।”

মহানবী (সা.) ও পবিত্র আহলে বাইতের ইমামদের পক্ষ থেকে ইমাম মাহদী (আ.)- এর আবির্ভাব সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে । সেখানে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) তার আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র মানব সমাজকে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত করবে এবং আধ্যাত্মিক জীবন দান করবে ।[৬৩] অসংখ্য হাদীসের সাক্ষ্য অনুযায়ী একাদশ ইমাম হযরত হাসান আসকারীর (আ.) সন্তানই ইমাম মাহদী (আ.) ।[৬৪] হাদীস সমূহের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- এর জন্মের পরে সুদীর্ঘকালের জন্যে তিনি অদৃশ্যে অবস্থান করবেন । তারপর তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন এবং অন্যায় ও অত্যাচারপূর্ণ বিশ্বে সত্যিকার অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন ।

তথ্যসূত্র:

১. 'ফসুলুল মুহিম্মাহ' (২য় মুদ্রণ), ১৪ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবে খারাযমি' ১৭ নং পৃষ্ঠা।

২. 'যাখাইরুল উকবা' ১৩৫৬ হিজরী মিশরীয় মুদ্রণ, ৫৮ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবে খারাযমি' ১৩৮৫ হিজরী নাজাফিয় মুদ্রণ, ১৬ থেকে ২২ নং পৃষ্ঠা। 'ইয়া নাবীউল মুয়াদ্দাহ' (৭ম মুদ্রণ), ৬৮ থেকে ৭২ নং পৃষ্ঠা।

৩. 'কিতাবুল ইরশাদ' (শেইখ মুফিদ), ১৩৭৭ হিজরী তেহরানের মুদ্রণ, ৪ নং পৃষ্ঠা। 'ইয়ানাবীউল মুয়াদ্দাহ' ১২২ নং পৃষ্ঠা।

৪. 'ফসুলুল মুহিম্মাহ' ২৮ থেকে ৩০ নং পৃষ্ঠা। 'তাযকিরাতুল খাওয়াস' ১৩৮৩ হিজরী নাজাফিয় সংস্করণ, ৩৪ নং পৃষ্ঠা। 'ইয়া নাবীউল মুয়াদ্দাহ' ১০৫ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবে খারাযমি' ৭৩ থেকে ৭৪ নং পৃষ্ঠা।

৫. 'ফসুলুল মুহিম্মাহ' ৩৪ নং পৃষ্ঠা।

৬. 'ফসুলুল মুহিম্মাহ' ২০ নং পৃষ্ঠা। 'তাযকিরাতুল খাওয়াস' ২০ থেকে ২৪ নং পৃষ্ঠা। 'ইয়া নাবীউল মুয়াদ্দাহ' ৫৩ থেকে ৬৫ নং পৃষ্ঠা।

৭. 'তাযকিরাতুল খাওয়াস' ১৮ নং পৃষ্ঠা। 'ফসুলুল মুহিম্মাহ' ২১ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবে খারাযমি' ৭৪ নং পৃষ্ঠা।

৮. 'মানাকিবে আলে আবি তালিব' (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন শাহরের আশুব), কোমে মুদ্রিত, ৩য় খণ্ড, ৬২ ও ২১৮ নং পৃষ্ঠা। 'গায়াতুল মারাম' ৫৩৯ নং পৃষ্ঠা। 'ইয়া নাবীউল মুয়াদ্দাহ' ১০৪ নং পৃষ্ঠা।

৯. 'মানাকিবে আলে আবি তালিব' ৩য় খণ্ড, ৩১২ নং পৃষ্ঠা। 'ফসুলুল মুহিম্মাহ্' ১১৩ থেকে ১২৩ নং পৃষ্ঠা। 'তাযকিরাতুল খাওয়াস' ১৭২ থেকে ১৮৩ নং পৃষ্ঠা।

১০. 'তাযকিরাতল খাওয়াস' ২৭ নং পৃষ্ঠা।

১১. 'তাযকিরাতুল খাওয়াস' ২৭ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবে খারাযমি' ৭১ নং পৃষ্ঠা। ১৮০. 'মানাকিব আলে আবি তালিব' ৩য় খণ্ড, ২২১ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবে খারাযমি' ৯২ নং পৃষ্ঠা।

১২. 'নাহজুল বালাগা' ৩য় খণ্ড, ২৪ নং অধ্যায়।

১৩. 'মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খণ্ড, ২১ থেকে ২৫ নং পৃষ্ঠা। 'যাখাইরুল উকবা' ৬৫ ও ১২১ নং পৃষ্ঠা।

১৪. 'মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খণ্ড, ২৮ নং পৃষ্ঠা। 'দালাইলুল ইমামাহ' (মুহাম্মদ বিন জারির তাবারী), ১৩৬৯ হিজরী নাজাফীয় মুদ্রণ, ৬০ নং পৃষ্ঠা। 'ফসুলুল মুহিম্মাহ' ১৩৩ নং পৃষ্ঠা। 'তাযকিরাতুল

খাওয়াস্’ ১৯৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখু ইয়াকুবী’ ১৩১৪ হিজরীতে নাজাফে মুদ্রিত, ২য় খণ্ড, ২০৪ নং পৃষ্ঠা। ‘উসুলুল ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৬১ নং পৃষ্ঠা।

১৫. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ), ১৭২ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৪৪ নং পৃষ্ঠা।

১৬. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ), ১৭২ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৩ নং পৃষ্ঠা। ‘আল ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ, (আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবাহ), ১ম খণ্ড, ১৬৩ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১৪৫ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ১৯৭ নং পৃষ্ঠা।

১৭. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ), ১৭৩ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৩৫ নং পৃষ্ঠা। ‘আল ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ, (আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বিন কুতাইবাহ), ১ম খণ্ড, ১৬৪ নং পৃষ্ঠা।

১৮. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ), ১৭৪ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৪২ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৪৬ নং পৃষ্ঠা।

১৯. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ), ১৮১ নং পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল হুদাহ’ ৫ম খণ্ড, ১২৯ ও ১৩৪ নং পৃষ্ঠা।

২০. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ১৭৯ নং পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল হুদাহ্’ ৫ম খণ্ড, ১৫৮ ও ২১২ নং পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল ওয়াসিয়াহ’ (মাসউদী) [১৩২০ হিজরীতে তেহরানে মুদ্রিত] ১২৫ নং পৃষ্ঠা।

২১. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ১৮২ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখু ইয়াকুবী’ ২য় খণ্ড, ২২৬- ২২৮ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১৫৩ নং পৃষ্ঠা।

২২. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৮ নং পৃষ্ঠা।

২৩. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৮ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ১৮২ নং পৃষ্ঠা। ‘আল ইমামাহ্ ওয়াস্ সিয়াসাহ’ ১ম খণ্ড, ২০৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ২য় খণ্ড, ২২৯ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১৫৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ২৩৫ নং পৃষ্ঠা।

২৪. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২০১ নং পৃষ্ঠা।

২৫. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৯ নং পৃষ্ঠা।

২৬. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২০১ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৬৮ নং পৃষ্ঠা।

২৭. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২০৪ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৭০ নং পৃষ্ঠা। ‘মাকাতিলুত তালিবিন’ ২য় সংস্করণ, ৭৩ নং পৃষ্ঠা।

২৮. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২০৫ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৭১ নং পৃষ্ঠা। ‘মাকাতিলুত তালিবিন’ ২য় সংস্করণ, ৭৩ নং পৃষ্ঠা।

২৯. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৯ নং পৃষ্ঠা।

৩০. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৯৯ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২১৪ নং পৃষ্ঠা।

৩১. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ৮৯ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২১৪ নং পৃষ্ঠা।

৩২. ‘বিহারুল আনোয়ার’ ১০ম খণ্ড, ২০০, ২০২ ও ২০৩ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৩. ‘মাকাতিলুত তালেবিন’ ৫২ ও ৫৯ নং পৃষ্ঠা।

৩৪. ‘তাযকিরাতুস খাওয়াস্’ ৩২৪ নং পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল হুদাহ’ ৫ম খণ্ড, ২৪২ নং পৃষ্ঠা।

৩৫. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড, ১৭৬ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ৮০ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ১৯০ নং পৃষ্ঠা।

৩৬. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৪৬ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ১৯৩ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ১৯৭ নং পৃষ্ঠা।

৩৭. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৬৯ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ১ম খণ্ড, ২৪৫ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২০২ ও ২০৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৬৩ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৪০ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ৯৪ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ২১০ নং পৃষ্ঠা।

৩৮. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৪৫ থেকে ২৫৩ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুর রিজাল’ মুহাম্মদ ইবনে উমার ইবনে আব্দুল আজিজ কাশী। ‘কিতাবুর রিজাল’ - মুহাম্মদ ইবনে হাসান আত তুসী।

৩৯. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৭২ নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ’ ১১১ নং পৃষ্ঠা। ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৫৪ নং পৃষ্ঠা। ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১১৯ নং পৃষ্ঠা। ‘ফসুলুল মুহিম্মাহু’ ২১২ নং পৃষ্ঠা। ‘তাযিকরাতুল খাওয়াস্’ ৩৪৬ নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ২৮০ নং পৃষ্ঠা।

৪০. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৫৪ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ২০৪ ও নং পৃষ্ঠা। ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ২৪৭ নং পৃষ্ঠা।

৪১. ‘ফসুলুল মুহিম্মাহ’ ২১২ ও নং পৃষ্ঠা। ‘দালাইলুল ইমামাহ’ ১১১ নং পৃষ্ঠা। ‘ইসবাতুল ওয়াসিয়াহ্’ ১৪২ নং পৃষ্ঠা।

৪২. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৩১০ নং পৃষ্ঠা ।

৪৩. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৭৬ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৭০ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২১৪ থেকে ২২৩ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ’ ১৪৬ থেকে ১৪৮ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৪৮ থেকে ৩৫০ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩২৪ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা ।

৪৪. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৭৯ থেকে ২৮৩ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ১৪৭ ও ১৫৪ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মহিম্মাহু’ ২২২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩২৩ ও ৩২৭ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১৫০ নং পৃষ্ঠা ।

৪৫. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৮৬ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৮৪ থেকে ২৯৬ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ১৭৫ থেকে ১৭৭ নং পৃষ্ঠা। ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ২২৫ থেকে ২৪৬ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ১৮৮ নং পৃষ্ঠা ।

৪৬. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৮৮ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ২৩৭ নং পৃষ্ঠা।

৪৭. ‘দালাইরুল ইমামাহ’ ১৯৭ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৬৩ নং পৃষ্ঠা ।

৪৮. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৮৯নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৯০ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৩৭ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৫২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৬৩ নং পৃষ্ঠা ।

৪৯. ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৫১ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইহতিজাজ’ (আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব আত তাবারসি), - হিজরী ১৩৮৫ সনের নাজাফীয় মুদ্রণ, ২য় খণ্ড, ১৭০ থেকে ২৩৭ নং পৃষ্ঠা ।

৫০. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ২৯৭ নং পৃষ্ঠা । ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৯৭ থেকে ৪৯২ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ২০১ থেকে ২০৯ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৩৭৭ থেকে ৩৯৯ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৪৭ থেকে ২৫২ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৫৮ নং পৃষ্ঠা ।

৫১. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৪৯৭ থেকে ৫০২ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ৩০৭ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ্’ ২১৬ থেকে ২২২ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ’ ২৫৯ থেকে ২৬৫ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযিকরাতুল খাওয়াস্’ ৩৬২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৪০১ থেকে ৪২০ নং পৃষ্ঠা ।

৫২. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ৩০৭ থেকে ৩১৩ নং পৃষ্ঠা । ‘উসূলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৫০১ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৬১ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযকিরাতুল খাওয়াস’ ৩৫৯ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৪১৭ নং পৃষ্ঠা । ‘ইসবাতুল ওয়াসিয়াহ’ ১৭৬ নং পৃষ্ঠা । ‘তারীখে ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ২১৭ নং পৃষ্ঠা । ‘মাকাতিলুত তালিবিন’ ৩৯৫ নং পৃষ্ঠা । ‘মাকাতিলুত তালিবিন’ ৩৯৫ ও ৩৯৬ নং পৃষ্ঠা ।

৫৩. মাকাতিলুত তালিবীন ৩৯৫ পৃষ্ঠা ।

৫৪. মাকাতিলুত তালিবীন ৩৯৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩৯৬পৃষ্ঠা ।

৫৫. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ৩১৫ নং পৃষ্ঠা । ‘দালাইলুল ইমামাহ’ ২২৩ নং পৃষ্ঠা । ‘ফুসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৬৬ থেকে ২৭২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৪২২ নং পৃষ্ঠা । ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৫০৩ নং পৃষ্ঠা । ‘তাযিকরাতুল খাওয়াস’ ৩৬২ নং পৃষ্ঠা ।

৫৬. ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ৩২৪ নং পৃষ্ঠা । ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৫১২ নং পৃষ্ঠা । ‘মানাকিবে ইবনে শাহরে আশুব’ ৪র্থ খণ্ড ৪২৯ ও ৪৩০ নং পৃষ্ঠা ।

৫৭. ‘সহীহ তিরমিযি’ ৯ম খণ্ড, হযরত মাহদী (আ.) অধ্যায় । ‘সহীহ্ ইবনে মাযা’ ২য় খণ্ড, মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব অধ্যায় । ‘কিতাবুল বায়ান ফি আখবারি সাহেবুজ্জামান’ - মুহাম্মদ ইউসুফ শাফেয়ী । ‘নুরুল আবসার’ - শাবলাঞ্জি । ‘মিশকাতুল মিসবাহ্’ - মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খাতিব । ‘আস্ সাওয়াইক আল মুরিকাহ’ - ইবনে হাজার । ‘আস আফুর রাগিবিন’ - মুহাম্মদ আস সাবান । (‘কিতাবুল গাইবাহ’ - মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম নোমানী । ‘কামালুদ দ্বীন’ - শেইখ সাদুক । ‘ইসবাতুল হুদাহ্’ - মুহাম্মদ বিন হাসান হুর আল আমেলী । ‘বিহারুল আনোয়ার’ - আল্লামা মাজলিসি ৫১ ও ৫২ নং খণ্ড দ্রষ্টব্য ।)

৫৮. ‘উসুলে ক্বাফী’ ১ম খণ্ড, ৫০৫ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল ইরশাদ’ (শেইখ মুফিদ) ৩১৯ নং পৃষ্ঠা ।

৫৯. রিজালে কাশী, রিজালে তুসী, ফেহরেস্ত - এ তুসী ও অন্যান্য রিজাল গ্রন্থসমূহ ।

৬০. ‘বিহারুল আনোয়ার’ ৫১ নং খণ্ড, ৩৪২ ও ৩৪৩ থেকে ৩৬৬ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল গাইবাহ শেইখ মুহামাদ বিন হাসান তুসী - দ্বিতীয় মুদ্রণ - ২১৪ থেকে ২৪৩ পৃষ্ঠা । ‘ইসবাতুল হুদাহু’ ৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

৬১. বিহারুল আনোয়ার’ ৫১ নং খণ্ড, ৩৬০ থেকে ৩৬১ নং পৃষ্ঠা । ‘কিতাবুল গাইবাহ্’ - শেইখ মুহাম্মদ বিন হাসান তুসী’ ২৪২ নং পৃষ্ঠা ।

৬২. নমুনা স্বরূপ একটি হাদীসের উদ্ধৃতী এখানে দেয়া হলঃ এ বিশ্বজগত ধ্বংস হওয়ার জন্যে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই সে দিনটিকে এতখানি দীর্ঘায়িত করবেন, যাতে আমারই সন্তান মাহদী (আ.) আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে । (ফসুলুল মুহিম্মাহ্’ ২৭১ নং পৃষ্ঠা ।)

৬৩. উদাহরণ স্বরূপ দু 'টি হাদীসের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল, "হযরত ইমাম বাকের (আ.) বলেছেনঃ যখন আমাদের কায়েম কিয়াম করবে, তখন মহান আল্লাহ তার ঐশী শক্তিতে সমস্ত বান্দাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির প্রতিপালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণরূপে পূর্ণত্ব দান করবেন। (বিহারুল আনোয়ার' ৫২তম খণ্ড, ৩২৮ ও ৩৩৬ নং পৃষ্ঠা।) আবু আব্দুল্লাহ্ (আ.) বলেনঃ সমস্ত বিদ্যা ২৭টি অক্ষরের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। রাসূল (সা.)- এর আনীত জনগণের উদ্দেশ্যে সমস্ত বিদ্যার পরিমাণ মাত্র দুটি অক্ষর সমান। মানবজাতি আজও ঐ দুটি অক্ষর পরিমাণ জ্ঞানের অধিকের সাথে পরিচিত হয়নি। তবে যখন আমাদের কায়েম কিয়াম করবে তখন আরও ২৫টি অক্ষরের বিদ্যা জনসমাজে প্রকাশ ঘটাবেন। একইসাথে পূর্বের ঐ দু 'টি অক্ষরের বিদ্যাও তিনি সংযুক্ত করবেন, ফলে জ্ঞান ২৭টি অক্ষরে পরিপূর্ণ হবে। (বিহারুল আনোয়ার, ৫২তম খণ্ড ৩৩৬ নং পৃষ্ঠা।)

৬৪. উদাহরণ স্বরূপ আরো একটি হাদীসের উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হল : জনাব সিক্কিন বিন আবি দালাফ বলেনঃ আমি হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ বিন রেজা (আ.) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন : আমার পরবর্তী ইমাম হবে আমারই পুত্র হাদী। তার আদেশ ও বক্তব্য সমূহ আমারই আদেশ ও বক্তব্যের সমতুল্য আর তাঁর আনুগত্য আমাকে আনুগত্য করার শামিল। হাদীর পরবর্তী ইমাম হবে তারই সন্তান হাসান আসকারী। যার আদেশ ও বক্তব্য সমূহ তার পিতারই আদেশ ও বক্তব্য ও আদেশসম। একইভাবে তার আনুগত্য তার বাবারই আনুগত্যের শামিল। (অতঃপর ইমাম যাওয়াদ (আ.) নীরব থাকলেন) - তাকে বলা হল : হে রাসূলের সন্তান ! হাসান আসকারীর পরবর্তী ইমাম কে হবেন? (ইমাম যাওয়াদ) প্রচন্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন : হাসান আসকারীর পরবর্তী ইমাম তারই সন্তান কায়েম (মাহদী) সত্যের উপর অধিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুত। (বিহারুল আনোয়ার' ৫১তম খণ্ড, ১৫৮ নং পৃষ্ঠা।)

সূচীপত্রঃ